اصول الاسلام

ইসলামের মূলনীতি

ইদরিস কান্ধলবি রাহ.

অনুবাদ
আরিফ আফ্‌ফান

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সকল পরিপূর্ণতার অধিকারী ও সমস্ত অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি শ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বশেষ রাসুল। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথি-সঙ্গীদের ওপর, যারা ছিলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ অনুসারী এবং ইসলামের তরে সর্বত্যাগী।

পৃথিবীতে ধর্ম, মতবাদ, পথ ও মতের কোনো অন্ত নেই। যার যেমন সুবিধা, সে তেমন ইলাহ গ্রহণ করে নিয়েছে। নিজেদের দাবি অনুপাতে যদি সবকিছুই সঠিক ও বিশুদ্ধ হয়ে যেত, তাহলে পৃথিবীতে কোনো ভুলভ্রান্তি মোটেও স্থান পেত না, সবকিছুই সত্য হয়ে যেত। ইসলাম সত্য ধর্ম, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, সমস্ত নবি-রাসুলের ধর্ম এবং পৃথিবীর বুকে অবস্থিত বিকৃতিহীন একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্ম। পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্ম হয়তো বিকৃত, হয়তো অপূর্ণ, নয়তো মানবরচিত অথবা শুধু অলীক কিস্সাকাহিনির সমষ্টি। এসব ধর্ম প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমির পানিবিহীন ঝরনা ও নালার মতো, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে বটে, কিন্তু তৃষ্ণার্ত কোনো প্রাণীর পিপাসা মিটাতে একেবারেই ব্যর্থ। এসব ধর্ম মানুষের পার্থিব জীবনকে একমাত্র উপভোগ্য বস্তু বানিয়ে আখিরাতের অনন্ত জীবন বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম, মানুষের স্বভাবের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলামধর্মের আকিদা-বিশ্বাস, শিক্ষাদীক্ষা , আচারব্যবহার, ইবাদত ও লেনদেন নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে, যে-কেউ নির্দ্বিধায় মেনে নিতে বাধ্য হবে, ইসলামই শ্রেষ্ঠ, ইসলামই অনন্য। স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের ওপর টিকে থাকলে কেউ কখনো ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো মতবাদে দীক্ষিত হতো না, হতে পারত না। কারণ সকল মানুষই ইসলাম গ্রহণের স্বভাবজাত যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে এটা নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাই মানুষ ইসলাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে নিজেই এমন বিপত্তি টেনে আনে, যার আফসোসে কিয়ামতের দিন হাতের আঙুল কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলতে হবে। এরাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে, হায়, যদি আজ মাটি হতাম!

ইসলামের মৌলিক আকিদা সাধারণত সাতটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। যথা, আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল, কিয়ামত, ভালো-মন্দ তাকদির ও আখিরাতের জীবনে বিশ্বাস রাখা। ইসলামের এই সবগুলো আকিদার ভিত্তিমূল ও স্তম্ভ যথাক্রমে তাওহিদ, রিসালাত ও কিয়ামত। ইসলামের এই আকিদা তিনটি সর্বস্বীকৃত, সর্বজনবিদিত। কারণ এগুলোর মাঝে বাকিগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আকিদা ধর্মের প্রাণ। প্রাণ ছাড়া যেমন জীবিত থাকা সম্ভব নয়, তেমনই আকিদা ছাড়া ধর্ম টিকে থাকা অসম্ভব। আকিদা ব্যতীত ধর্মের কথা ভাবাই যায় না, কারণ আকিদাই হলো ধর্ম। কোনো জাতির আকিদা ও বিশ্বাসে যখন পচন ধরে, সে জাতির ধর্ম বলতে কিছু রসম-রেওয়াজ আর অনুষ্ঠানাদি অবশিষ্ট থাকলেও থাকতে পারে, ধর্ম নামে কোনোকিছুর অস্তিত্ব সেখানে থাকে না। কারণ যার মাথাই নেই তার কান আর চোখ কী কাজে আসবে? আকিদা বিশুদ্ধ হলে, ধর্মের অন্য সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আকিদার গায়ে কলঙ্কের কালি লেগে গেলে তা সর্বাঙ্গে একাকীই মেখে যায়, নিজেকে আর কেশক্লিষ্ট হয়ে মাখাতে হয় না।

আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে মেনে নেওয়ার পর মানুষের জন্য প্রথম কর্তব্য হিসেবে বর্তায়, তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আর এখানেই নবি-রাসুলদের মান্য করা মানুষের জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা ব্যতীত আল্লাহর বিধিনিষেধ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তবে যাদের বিবেক খুব চালু, বস্তুবাদের পিঠে চড়ে সায়েন্স আর দর্শনকে পাখা বানিয়ে, মস্তিষ্কের ধাঁধায় পড়ে যারা পৃথিবীর কিছু বাহ্যিক বস্তুর পাত্তা লাগাতে পেরে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে তাদের জন্য নবি-রাসুল তো সাধারণ বিষয়, আখিরাতও সামান্য বিষয়, বরং আল্লাহকেই বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই।

উসুলে ইসলাম বা ইসলামের মূলনীতি গ্রন্থটি আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রহ. রচিত 'আকাইদুল ইসলাম' ও 'ইলমুল কালাম' গ্রন্থদ্বয়ের সারনির্যাস। এতে তিনি ইসলামি আকিদার অনন্যতা ও উৎকর্ষ খুব জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাথে সাথে তিনি অন্যান্য ধর্ম-মতবাদ ও আকিদা-বিশ্বাস উল্লেখ করে সেগুলোকে অকাট্য দলিল-প্রমাণের আলোকে খণ্ডন করেছেন। এরপর তিনি নবুয়তের ওপর উত্থাপিত নাস্তিক, মুরতাদদের বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও অভিজ্ঞ আলিমদের বক্তব্য

দ্বারা সমুচিত উত্তর পেশ করেছেন। মিরাজ ও মুজিজা নিয়ে দার্শনিক ও সায়েন্টিস্টদের মস্তিষ্কপ্রসূত দাবিদাওয়া ও তাদের অসাড় মতবাদের গোড়ায় আঘাত হেনে সেগুলোকে শুধু নড়বড়ে করে দেওয়াই হয়নি বরং সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। আখিরাত, কবরজগৎ, রুহ ও ফেরেশতা প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক আকিদাগুলো মূলনীতির আলোকে গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। আমরা আশা করি গ্রন্থটি আকিদা ও সিরাহ অধ্যয়নের মূলনীতি হিসেবে কাজে দেবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে নিবেদন, ভাষার দৈন্য থাকায় ও কাঁচা হাতের অনুবাদ হওয়ায় এতে অপরিপক্বতার ছাপ লেগে থাকা খুবই স্বাভাবিক। এরপরও আমরা সর্বাঙ্গসুন্দর করতে আমাদের চেষ্টায় কমতি করিনি।

এই বইয়ে যা-কিছু উপকারী ও কল্যাণকর সবই মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, আর যা-কিছু ভুলত্রুটি ও অকল্যাণকর সবই আমাদের অযোগ্যতার ফল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন।

আরিফ আফ্ফান

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ اَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের পালনকর্তা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা ও অভিভাবক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি শেষ নবি এবং সর্বশেষ রাসুল। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন সাথি-সঙ্গী ও বংশধর সকলের প্রতি এবং তাদের সাথে আমাদের ওপরও শান্তি বর্ষণ করুন হে অতিশয় দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ তাআলা!

সকলেরই জানা উচিত প্রত্যেক ধর্মেই মৌলিক দুটি বিষয় রয়েছে, একটি উসুল বা আকাইদ, অন্যটি ফুরু বা শাখাগত হুকুম-আহকাম ও বিধানাবলি। উসুল ও আকিদার আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে আর ফুরু ও শাখা-প্রশাখাগত বিধানাবলির ধারাবাহিকতা অত্যন্ত বিস্তৃত। কোনো ধর্ম হক-বাতিল বা সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য উক্ত ধর্মের আকিদা তথা ধর্মবিশ্বাস জানা একান্ত জরুরি। কেননা শাখাগত বিধিবিধান আকিদার অনুগামী হয়ে থাকে। কাজেই আকিদা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে বিধিবিধান আপনা-আপনিই বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

আকিদাও এক প্রকারের খবর বা সংবাদ। তবে তা বাস্তবতার নিরিখে বিবেকবুদ্ধিসমেত যাচাই-বাছাই করার দাবি রাখে। এবং তা বাস্তব ও বিবেকসমেত হওয়ার ওপর ধর্মের সঠিক-বেঠিক, ভুল-শুদ্ধ ও সত্য-মিথ্যা হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু বিধিবিধান এমন নয় কেননা, এগুলো স্থানকালপাত্র ও ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত ও ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু আকিদা ও মূলনীতির কখনো হ্রাস-বর্ধন ও হেরফের হয় না। এ কারণেই ইসলামি আকিদার উৎকর্ষতা ও অনন্যতা যৌক্তিক প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত করা আবশ্যক। কিন্তু শাখাগত বিধিবিধান যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা আবশ্যক নয়। কেননা অনেক শাখাগত বিধান এমন রয়েছে যা শুধু

শ্রবণ ও বর্ণনানির্ভর। তবে শাখাগত বিধানের জন্য এতটুকু আবশ্যক, তা বিবেকবিরোধী হতে পারবে না। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামের সমস্ত আকিদাই যৌক্তিক এবং ইসলামের শাখাগত কোনো একটি বিধানও বিবেকবিরোধী নয়। আমরা এ ছোট্ট পুস্তিকাটিতে সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামি আকিদার যৌক্তিক ও দালিলিক আলোচনা পেশ করে ইসলামের হক্কানিয়াত, সত্যতা এবং সততা বিবেকবান সকলের নিকট সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তবে এ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ইসলামের মৌলিক তিনটি উসুল তথা তাওহিদ, রিসালাত ও কিয়ামত নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা ও কদাচিৎ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ পেশ করা। যাতে করে তা সত্যকামীদের জন্য রোগ নিরাময় ও প্রশান্তির বাহক হয়। এবং ইসলামবিরোধী ও দ্বিধাগ্রস্তদের হিদায়াতের মাধ্যম হয়।

আল্লাহই সঠিক পথের পথপ্রদর্শক, তাঁর হাতেই সবকিছুর চাবিকাঠি। তাওফিক একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আমরা তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।

ইসলামের সর্বস্বীকৃত মৌলিক আকিদা তিনটি

- তাওহিদ
- রিসালাত ও
- কিয়ামত

এই তিনটি বিষয় ইসলামের অন্য সমস্ত আকিদার মূল স্তম্ভ। উক্ত তিনটি বিষয়ের ওপর আকিদার সকল বিষয় নির্ভর করে। আমাদের আবশ্যকীয় কর্তব্য ইসলামবিরোধীদের সম্মুখে তাওহিদ ও রিসালাত সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে যুক্তির আলোকে প্রমাণিত করা। তাওহিদ ও রিসালাত প্রমাণিত হওয়ার পরে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আমাদের নিকট কোনো শাখাগত মাসআলার প্রমাণ তালাশ করলে উত্তরস্বরূপ আমাদের জন্য এটুকু বলে দেওয়া যথেষ্ট, এ বিধানটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অমুক হাদিস থেকে দ্ব্যর্থহীন বা ইঙ্গিতবাহক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এরপরে যদি বলে, উক্ত বিধানটি বিবেকবিরোধী, তখন আমাদের ওপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব উক্ত বিধানটি বিবেকবিরোধী নয় তা প্রমাণ করা। বরং তা বিবেকের পরিপন্থী ও মানুষের স্বভাবপ্রকৃতির প্রতিকূল হওয়া অসম্ভব। সম্মানিত লেখক (আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রহ.) *ইলমুল কালাম* ও *আকাইদুল ইসলাম* গ্রন্থে ইসলামি আকিদা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কাজেই এই গ্রন্থে শুধু ইসলামের মূল তিনটি উসুল তথা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত বর্ণনা করা মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তাওহিদ

ইসলামের প্রথম বরং সমস্ত আকিদার মূল স্তম্ভ ও রুহ হলো তাওহিদ। তাওহিদের শাব্দিক অর্থ, কোনো বস্তুকে এক জেনে একক হিসেবে মান্য করা। শরয়ি পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে দিল ও অন্তর থেকে নিরঙ্কুশভাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহিদ। অর্থাৎ অন্তরে এই বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলিতে কেউ তাঁর অংশীদার বা সমকক্ষ নেই।

তাওহিদের দুটি স্তর রয়েছে

প্রথম স্তর: কোনো সৃষ্টিজীবের উপাসনা করা ব্যতিরেকে এবং কাউকে উপকার-ক্ষতির মালিক মনে না করে আল্লাহ তাআলাকে সত্তা ও গুণাবলিতে একক মনে করার নাম তাওহিদ।

দ্বিতীয় স্তর: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর ওপর দৃষ্টি না রাখার নাম তাওহিদ।

দ্বিতীয় মত অবলম্বনকারীদের মতে, উপায়-উপকরণের ওপর দৃষ্টি রাখাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের নিকট তাওহিদের মর্ম হলো, সমস্ত উপায়-উপকরণের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার ওপর দৃষ্টি রাখা। তাওহিদের এই স্তরটি প্রথম প্রকার তাওহিদের স্তর থেকে পরিপূর্ণ ।

সুফি আলেমদের নিকট তাওহিদ মানে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের মুশাহাদা করার নাম। অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত ধ্বংসশীল অন্য সমস্ত বস্তু থেকে বিমুখ হয়ে লয়হীন চির অবিনশ্বর মহান সত্তা আল্লাহ তাআলার অভিমুখী হওয়া।

কবির ভাষায়—

তাওহিদের মর্ম হলো, আল্লাহ বিনা সকল হতে ভেতর-বাহির মুক্ত
হওয়া, তাওহিদেরই নুরানি পথে নিজেকে পুরো বিলিয়ে দেওয়া।
(অর্থাৎ ইমান ও ইবাদতের প্রশ্নে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল সত্তা হতে
নিজেকে মুক্ত রাখা।)

সাধারণ তাওহিদের সংক্ষিপ্ত স্বীকৃতি সমস্ত ধর্মের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি যে সম্প্রদায়ের মাঝে সরাসরি সুস্পষ্ট শিরক ও মূর্তিপূজা বিদ্যমান তারাও সবকিছুর কর্মবিধায়ক একজনকেই মনে করে। তবে তারা অবশ্য খোদার একাধিক রূপ ও অসংখ্য গুণাবলি সাব্যস্ত করে। খ্রিষ্টানরা বলে, খোদা তিনজন। কিন্তু তারা সাথে সাথে এ কথাও বলে, এক খোদারই তিনটি রূপ রয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি যতই ভুল হোক না কেন, এর দ্বারা অন্তত এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত হয়, তারা পুরোপুরি তাওহিদ তরক করতে সন্তুষ্ট নয়। বরং তারা তাওহিদ একেবারে পরিত্যাগ করার চেয়ে শিরকের সাথে সংমিশ্রণ করতে অধিক পছন্দ করে। যদিও তাদের এ সংমিশ্রণটা দুটি মেরুর মতো বিপরীত দুটি ভিন্ন বস্তু এক স্থানে একত্র করে করা হোক না কেন! মোটকথা, সাধারণ তাওহিদের সংক্ষিপ্ত স্বীকৃতি সমস্ত ধর্মের মাঝেই কমবেশি পাওয়া যায়।

কিন্তু ইসলাম; ধর্মকে এমন এক বিশেষত্ব ও স্বতন্ত্রতা দান করেছে যা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ তাওহিদের দিকে আহ্বান করে এবং যা শিরকের সমস্ত খড়কুটো ও লেশমাত্র থেকেও সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। ইসলামের একত্ববাদ হলো, সমস্ত জগৎকুলের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। একমাত্র তিনিই সমস্তকিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনিই সকলের প্রয়োজন পূরণ করেন এবং তিনিই সব ধরনের কষ্ট-ক্লেশ ও অংশীদারি ব্যতিরেকে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার আঞ্জাম দেন। তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে কেউ অংশীদার নয়। অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করা, জীবন-মৃত্যু ও অদৃশ্যের সংবাদ এবং রিজিক দান ও ইবাদতের উপযুক্ততা এ সমস্ত গুণাবলি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথেই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু ইসলাম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিকট অবতীর্ণ অবতার ও নবিদেরকেও এ সমস্ত গুণাবলির অধিকারী মনে করে থাকে। আর এটাই তাওহিদের পরিপন্থী।

ইসলামধর্ম তাওহিদকে পরিপূর্ণ করণার্থে তাওহিদ ফিজ-জাত তথা আল্লাহ তাআলাকে সত্তাগতভাবে এক বলে ঘোষণা করার সাথে সাথে গুণাবলিতে একক এবং ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত হওয়ারও চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে। এমনকি তাজিমি সিজদা (সম্মানপ্রদর্শনমূলক সিজদা) যা পূর্বের শরিয়তে বৈধ ছিল, ইসলাম তা শিরক সাব্যস্ত করে হারাম ঘোষণা করেছে।

অগ্নিপূজকদের আকিদা

অগ্নিপূজারিদের ধর্মীয় বিশ্বাসমতে, পৃথিবীতে দুটি শক্তি কাজ করে। একজন ইয়াজদান, অন্যজন আহরমন। এ দুজন চিরঞ্জীব অবিনশ্বর দুটি সত্তা। অবশ্য ইয়াজদান সমস্ত কল্যাণের সৃষ্টিকর্তা আর আহরমন অকল্যাণের প্রভু। ইয়াজদান সৃষ্টি ও নির্মাণ করে আর আহরমন মৃত্যু দেয় ও ধ্বংস করে। এ ধর্মবিশ্বাসকে যদিও যারদাসৃত নামক এক ব্যক্তির দিকে সম্বোধন করা হয় তবে এটিই অগ্নিপূজারিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলভিত্তি। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য দ্বারা জানা যায়, এ আকিদা যারদাস্তের পরে সৃষ্টি হয়েছিল। এই আকিদা কবে সৃষ্টি হয়েছিল এ নিয়ে আমাদের কোনো বিচারবিশ্লেষণ বা মাথাব্যথা নেই, বরং এখানে আমাদের দেখার বিষয় এ আকিদা শুদ্ধ নাকি অশুদ্ধ।

বিবেকসম্পন্ন সকল ব্যক্তির ঐকমত্যে আল্লাহ তাআলার জন্য সব দিক থেকে পরিপূর্ণতার অধিকারী হওয়া এবং সমস্ত অপারগতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি এবং সকলপ্রকার দোষ ও অপূর্ণতা থেকে পরিপূর্ণ পূত-পবিত্র হওয়া আবশ্যক। এবং যিনি খোদা হবেন, জগৎসমূহের বিদ্যমানতার লাগাম তাঁর একক মুষ্টিবদ্ধ থাকবে। জ্ঞানীদের ঐকমত্যে অগ্নিপূজকদের উক্ত বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করলে একজন ব্যক্তি এক খোদার সৃষ্ট, অন্যজন দ্বিতীয় খোদার সৃষ্ট মান্য করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর ইয়াজদান ও আহরমন উভয় প্রভুর মাঝেই অর্ধ অর্ধ করে ভাগে-যোগে স্বল্প ও অপূর্ণ প্রভুত্ব বিদ্যমান রয়েছে মান্য করতে হয়। অথচ ইসলামের ভাষ্যমতে, যিনি পরিপূর্ণ খোদায়ির মালিক ও যার মধ্যে প্রভুত্বের সমস্ত গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, একমাত্র তাঁকেই প্রভু বলা হয়। দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত প্রভুত্বের মাঝে কোনো অপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে না। এগুলো থেকে প্রভুর পবিত্র হওয়া একান্ত জরুরি। অগ্নিপূজকদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইয়াজদান ও আহরমন একে অন্যের অনধীন দুটি ভিন্ন শক্তি। একজন অপরজন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা দুজন সত্তা। অথচ প্রভু তো একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যার কোনো সমকক্ষ ও সাদৃশ্য নেই। প্রভুর কোনো সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে পারে না। ওই সত্তা প্রভুই-বা হতে পারে কী করে, যার সমান ও প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে? সুতরাং ইয়াজদান কখনোই প্রভু হতে পারে না, কারণ আহরমন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। আর আহরমনও প্রভু হওয়ার যোগ্যতা রাখে না কারণ, ইয়াজদান তার বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থিত।

সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল, দুই খোদাবিশিষ্ট বিশ্বাস তথা ইয়াজদান ও আহরমনের খোদা হওয়ার আকিদা কোনোভাবেই গ্রহনযোগ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ﴿٥١﴾

আর আল্লাহ বলেন, তোমরা দুজনকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো না। কেননা নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) এক ইলাহ (দুজন নন)।[১]

খ্রিষ্টানদের আকিদা

খ্রিষ্টানদের ধর্মমতে, (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) খোদা তিনজন। এক. পিতা তথা খোদা তাআলা, দুই. পুত্র তথা ঈসা আ., তিন. রুহুল কুদুস অর্থাৎ পবিত্র আত্মা। তাদের মতে, এই তিনজন সত্তাই ইবাদতের উপযুক্ত এবং সবকিছুর কর্মবিধায়ক। বরং এ তিনজন সত্তা চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব ও সবকিছুর একচ্ছত্র অধিকারী। হজরত মাসিহ আ. একসাথে বান্দা, মালিক, সাধারণ মানুষ এবং খোদা হওয়ার বিশেষ যোগ্যতা রাখেন। খ্রিষ্টানরা কখনো হজরত ঈসা আ.-কে শরীরবিশিষ্ট খোদা অর্থাৎ খোদা হজরত ঈসা আ.-এর রূপে প্রকাশ পেয়েছে বলে দাবি করে, আবার কখনো তাকে আল্লাহর পুত্র বলেও রব তোলে। বরং তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি হজরত ঈসা আ.-এর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে বলে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচারও করে।

উক্ত আকিদার খণ্ডন

হজরত ঈসা আ. কখনো দাবি করে বলেননি, আমি তোমাদের পূজিত প্রভু আর তোমরা আমার পূজারি বান্দা। হজরত ঈসা আ. হজরত মারয়াম আ.-এর পেট থেকে

---

১ (সুরা নাহল, ৫১)

প্রসব করা ও অন্যান্য মানুষদের ন্যায় পানাহারের প্রয়োজন অনুভব করা ইত্যাদি মানবীয় স্বভাবজাত গুণাবলি তিনি একজন মানুষ হওয়ার এবং প্রভু না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ প্রভুত্ব ও মুখাপেক্ষিতা একত্রিত হওয়া শুধু অবাস্তবই নয়, বরং অসম্ভবও বটে। হজরত ঈসা আ. আল্লাহ তাআলার বান্দা, এবং তিনি তাঁর ইবাদত করতেন এটি একটি সর্বস্বীকৃত বিষয়। সুতরাং তিনি খোদা হলে কখনোই ইবাদত করতেন না। কারণ যিনি মাবুদ হন, তিনি কখনো আবিদ বা ইবাদতগুজার বান্দা হতে পারেন না। বরং তিনি মাবুদ, পূজ্য ও উপাস্য হয়ে থাকেন। আল্লাহর পানাহ! খ্রিষ্টানরা এমন সত্তাকে খোদা বা সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করেছে, যিনি কিনা পেশাব-পায়খানা করা থেকেও পবিত্র নন!

খ্রিষ্টানরা শিরকের এক নম্বর স্তরে রয়েছে। কেননা তারা শুধু আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ক্ষেত্রে শিরক করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আল্লাহ তাআলার সত্তার ক্ষেত্রেও শিরকের প্রবক্তা। অর্থাৎ সত্তাগতভাবেও তারা তিনজন খোদার দাবি করে থাকে। এ জঘন্য আকিদা পোষণ করা সত্ত্বেও তারা আবার একত্ববাদের দাবি তুলে মুখে ফেনা উঠিয়ে বলে, 'আমাদের নিকট বাস্তবিক অর্থে যেমন তিনজন প্রভুর অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনই আমাদের নিকট বাস্তবিকভাবে এক খোদারও অস্তিত্ব রয়েছে।'

খ্রিষ্টানরা আল্লাহ তাআলাকে 'ওয়াহেদে হাকিকি' তথা বাস্তবিক একক সত্তা ও 'কাসিরে হাকিকি', অর্থাৎ বাস্তবিক একাধিক ইলাহ জ্ঞান করে। কিন্তু তাদের এতটুকুও অনুভূতি নেই, বাস্তবিক অর্থে কোনো সত্তা একক ও একাধিক হওয়া পরস্পরে দুটি বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল, বাস্তবিক অর্থে কোনো সত্তা একক ও একাধিক হওয়া বিপরীত মেরুর দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু একত্র হওয়ারই নামান্তর, যা সমস্ত বিবেকবানদের নিকট অবান্তর ও অসম্ভব একটি বিষয়। কাজেই খ্রিষ্টানদের উক্ত আকিদাও ভ্রান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

যদিও মেনে নেওয়া হয়, পাদরি মশাইদের নিকট বাস্তবিক অর্থে কোনো সত্তা একাধিক ও একক হওয়া বৈধ, তাহলে তারা শুধু ত্রিত্ববাদের ওপর তুষ্টহৃদ হলো কেন? তাদের তো উচিত ছিল চতুষ্টয়বাদ, পঞ্চত্ববাদ বরং ষষ্ঠত্ববাদ, সপ্তমত্ববাদ বরং এর চেয়েও আগে বেড়ে অষ্টমত্ববাদ, নবমত্ব ও দশমত্ববাদ বরং এর থেকেও আরও সামনে অগ্রসর হয়ে যত ইচ্ছা তত সংখ্যার ফিরিস্তি খোদার তালিকায় যুক্ত করা, যেমন তাদের নিকট এক সত্তার সাথে ত্রিত্ববাদ যোগ করা সম্ভব, তেমনই এর সাথে চারজন, পাঁচজন, আটজন, দশজন বা ততোধিক অসংখ্য খোদা যুক্ত করাও যৌক্তিক মনে হওয়ার কথা! মোদ্দা কথা এমন সম্মিলন তো তিন সংখ্যা ছাড়া অন্য সংখ্যার

মাঝেও পাওয়া সম্ভব, তাহলে বিশেষ করে তিন সংখ্যার ওপর খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস স্থাপন করা আর চার-পাঁচ সংখ্যাকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক নয় কি?

খ্রিষ্টান পাদরি মশাইরা নিরুত্তর হয়ে গেলে এক গাল বড় মুখ করে বলে, এই বিষয় তথা ত্রিত্ববাদ মুশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ যার বিদ্যমান হওয়া দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত, তবে এর মূল অর্থ, প্রকৃত অবস্থা ও নিগূঢ় রহস্যভেদ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আমাদের মতো ত্রুটিপূর্ণ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি ও আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আফসোস এবং শত আফসোস খ্রিষ্টানদের প্রতি! তারা মুহালাত (যার বক্তব্য, উদ্দিষ্ট অর্থ এবং অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতা সুনিশ্চিতরূপে বোধগম্য নয়) ও মুশাবিহাতের মাঝে পার্থক্য বিধান করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলি এবং মানুষের রুহ ও এধরনের বস্তু, যা অস্তিত্বের দিক দিয়ে বিদ্যমান, তবে প্রকৃত অবস্থা ও আসল স্বরূপ অজ্ঞাত, এগুলো মুশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যে বস্তুর বিদ্যমানতা জানা যায়, তবে মূল প্রকৃতি ও বাস্তবিক অবস্থা জানা যায় না এবং বিবেকবুদ্ধি যার বাস্তবতা অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, এমন বিষয়কে মুশাবিহাত বলে। কিন্তু মুহালাতের ক্ষেত্রে এমন বিমূঢ়তা সৃষ্টি হয় না। তা অবিদ্যমান ও অস্তিত্বহীন হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। মুশাবিহাতের ক্ষেত্রে জানা যায় না। আর মুহালাতের ক্ষেত্রে জানার বিষয়টি বোধগম্য না হওয়া ও অসম্ভব হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে না জানা এবং জানার জ্ঞান না থাকার মাঝে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। কবির ভাষায়,

মুহাম্মাদের মর্যাদা যে মানতে চায়, সে মানতে পারে,

তা না হলে জাহান্নামে জ্বলতে হবে, জ্বলতে পারে।

তাওবা! তাওবা!! ঈসাকে কি কেউ খোদার পুত্র বলতে পারে?

তাহলে সে ঈসা মাসিহর দাদার নামও বলতে পারে?

ইয়াহুদিদের আকিদা

ইয়াহুদিরা সাধারণত আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রবক্তা। তবে তাদের একটি দল খ্রিষ্টানদের মতো হজরত উজাইর আ.-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। কুরআন কারিমে ইয়াহুদিদের এই দলের আলোচনা করা হয়েছে,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

ইহুদিরা হজরত উজাইর আ.-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। আর নাসারারা মাসিহকে আল্লাহর পুত্র বলে।[২]

কিন্তু বর্তমান ভূপৃষ্ঠে এই দলের কোনো অস্তিত্ব আছে কি না আমাদের জানা নেই।

হিন্দুধর্ম

হিন্দু মতাদর্শ কোনো এক ধর্মের নাম নয়। শত শত বরং হাজার হাজার দলে বিভক্ত মতবাদের নাম হিন্দুধর্ম। তারা পরস্পরে এতটা বিরোধ ও মতানৈক্যপূর্ণ যে, কোনোভাবেই তাদের আকিদা ও কাজের মাঝে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভব নয়। এবং কোনোভাবে তা করা সম্ভব হবেও না। হিন্দুধর্ম এক আজিব মতবাদ! তাদের নির্দিষ্ট কোনো উপাস্য নেই। বরং এক-একটি গোষ্ঠী পৃথক পৃথক খোদার দাবিদার। কোনো সম্প্রদায় তিনজন, কোনো গোষ্ঠী এক লক্ষ, কেউ দু-লক্ষ, কেউ আবার ত্রিশ কোটি, কেউ এর থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে তেত্রিশ কোটি প্রভুরও পূজা করে!

একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

এই গ্রন্থ লেখার ত্রিশ বছর পূর্বে ভারতে হিন্দুদের জনসংখ্যা ছিল মাত্র বিশ কোটি। একবার একজন আলিম বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেন, হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা তো বিশ কোটি, তবে তাদের উপাস্য ও দেবতাদের সংখ্যা ত্রিশ কোটিরও বেশি! এখন যদি বিশকে ত্রিশের মধ্যে ভাগ করা হয় তাহলে একেকজন হিন্দুর জন্য দেড়জন করে দেবতা ভাগে পড়বে। এই হিসাব দ্বারা হিন্দুদের দেবতাদের সংখ্যা তাদের চেয়ে দেড়গুণ বেড়ে যায়।

কোনো কোনো হিন্দু সম্প্রদায় শ্রী রামচন্দ্রকে উপাস্য মনে করে পূজার্চনা করে। তাদের মতে প্রভুরা দেবতার রূপে মর্ত্যলোকে সিদ্ধিলাভ করে থাকে। এ কারণে তারা

---

২ (সুরা তাওবা,৩০)

অবতারদেরকে খোদা বলে জ্ঞান করে। এমনকি বর্ণিত আছে, তাদের অবতার রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে লঙ্কার রাজা রাবণ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রামচন্দ্র পত্নীবিয়োগে দিগবিদিক উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ভবগুরে হয়ে তালাশ করতে করতে পরিশেষে যখন খোঁজ পেল লঙ্কার রাজা রাবণ তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তখন রামচন্দ্রজি হনুমানজির নিকট থেকে সাহায্য নিয়ে রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বীয় পত্নীকে উদ্ধার করে। আল্লাহর পানাহ! খোদাও কি কোনো রমণীর প্রণয়লীলায় উন্মাদ হয়ে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বাউন্ডুলে হতে পারে? খোদার পত্নীকে কি কখনো কেউ অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারে? খোদার কী হলো যে, স্বীয় স্ত্রীকেও নিজে রক্ষা করতে সক্ষম হলো না?

কোনো কোনো দল শ্রীকৃষ্ণ মহারাজকে উপাস্য হিসেবে মান্য করে। হিন্দুদের মাঝে একদল লিঙ্গপূজাও করে। এ গোষ্ঠীর লিঙ্গপূজার মূল কারণ, তাদের ধর্মমতে প্রাচীন কালে একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণুতে প্রভুত্ব নিয়ে তর্কাতর্কি বাধে। ব্রহ্মা বলে, আমি প্রভু আর বিষ্ণু বলে, আরে বেটা আমি প্রভু! তখন হঠাৎ তাদের সামনে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি কোষ উপস্থিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকলে তার থেকে আকস্মিক ক্ষীণ শব্দে ওঁ-ওঁ আওয়াজ বের হতে থাকে। এবং কোষের এক পার্শ্বে তিনটি অক্ষর লেখা দৃষ্টিগোচর হয়। যার অর্থ করা হয় কোষই সমস্ত সৃষ্টিজীবকে বানিয়েছে। এ কারণে তখন থেকে তারা কোষ তথা লিঙ্গপূজার উদ্ভাবন করে। মোটকথা হিন্দুধর্ম এ পরিমাণ নির্লজ্জ বে-হায়া কল্পকাহিনি ও অসাড় ঘটনাবলির সংমিশ্রণের সমষ্টি, যা বচন খরচে খণ্ডন করাও অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয়।

আর্য সমাজ

হিন্দুদের অসংখ্য দল-উপদলের মধ্য হতে আর্য সমাজ উল্লেখযোগ্য একটি দল। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী। পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বামীজি বিরজানন্দ স্বরস্বতী চন্ডিশের চেলা-চামুণ্ডা ছিল। দয়ানন্দ স্বরস্বতী বেদ ও উপনিষদের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয় এবং এর সাথে সাথে নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রেও বেগতিক পাণ্ডিত্য অর্জন করে। তার মনোবাসনা ছিল হিন্দুধর্মের সব ধরনের দুর্বল দিক এবং সব রকমের দোষ-ত্রুটি বেছে বের করে নতুন দর্শনশাস্ত্রের বিকল্প ও অনুরূপ একটি মানবধর্ম আবিষ্কার করে হিন্দুধর্মকে যুগপৎ একটি শক্তিশালী ধর্মে রূপান্তরিত করা। এ কারণে একদিকে সে তাওহিদের দাবি তুলে বলতে থাকে, আমরা আল্লাহ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি তাঁর কোনো অংশীদার নেই। অন্যদিকে বলে বেড়ায়, রুহ ও বস্তু অনাদি চিরন্তন। আল্লাহ তাআলা রুহ ও বস্তুকে সৃষ্টি করেননি, বরং তা একাকীভাবেই সৃষ্টি হয়ে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। রুহ ও বস্তু আল্লাহ তাআলা ঘটনাক্রমে পেয়ে যান। এরপর থেকে আল্লাহ তাআলা এই দুই বস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের বস্তু সৃষ্টি করতে থাকেন। তাদের মতে, আল্লাহ তাআলা যদি বস্তু, অণু-পরমাণু না পেতেন, না আসমান সৃষ্টি করতে পারতেন, না চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ-তারা-নক্ষত্র ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে সক্ষম হতেন! আর বস্তুর সাথে রুহ না পেলে জিন-ইনসান ও প্রাণিকুল কিছুই সৃষ্টি করতে পারতেন না।

এ দল বাস্তবিক অর্থে আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানে না। বরং আর্য সমাজের আকিদা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তারা আল্লাহ তাআলাকে সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক বলে স্বীকার করতেও নারাজ। কেননা তাদের মতে, আল্লাহ তাআলা রুহ ও বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে কোনোকিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নন এবং তিনি রুহ ও বস্তুকে ধ্বংস করতেও পারেন না।

একটি সন্দেহের অপনোদন

কোনো কোনো গণ্ডমূর্খ ও কলুর বলদ বলে, আল্লাহ তাআলা যদি সবকিছুর কর্মবিধায়ক ও নিয়ন্তা হয়েই থাকেন, তাহলে তো নিজের অনুরূপ অন্য আরেকজন প্রভু সৃষ্টি করতেও সক্ষম হবেন! অথচ তারা ঠাহর করতে পারে না, আল্লাহ তাআলা সমস্ত পরিপূর্ণতার গুণাবলিতে গুণান্বিত। এবং সব ধরনের অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটি

থেকে পূত-পবিত্র। কাজেই তাঁর মধ্যে এমন কোনো গুণাবলি নির্ধারণ করা কখনোই সম্ভব নয়, যা তাঁর গুণাবলির পরিপূর্ণতার পরিপন্থী এবং অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটির কারণ বোঝায়। সুতরাং খোদার অনুরূপ ভিন্ন কোনো খোদা সৃষ্টি করা তাঁর এক ও একক হওয়া গুণাবলির পরিপন্থী। এবং কেউ তাঁর সাদৃশ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াও এক ধরনের ত্রুটি। এজন্য দ্বিতীয় কোনো খোদা কখনোই নির্ধারণ করা যাবে না। কেননা এই নির্ধারণ করাটাই সব থেকে বড় ভুল, অর্থাৎ শিরক।

বৌদ্ধদের আকিদা

বর্তমানে এ ধর্মাবলম্বীরা চীন, জাপান, তিব্বত, নেপাল, বার্মা ও সাইলুন নামক বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক দেশের বৌদ্ধদের ধর্ম আলাদা ও ধর্মীয় বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন। কিছু গবেষকের রচনা দ্বারা বোঝা যায়, বৌদ্ধধর্মে আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার আকিদাই বিদ্যমান নেই। বরং তাদের মতে, বৌদ্ধধর্ম একটি বস্তুবাদী ও যুগবাদী ধর্ম। কেউ কেউ বলেন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তারা আল্লাহ এক ও তাঁর কোনো শরীক নেই, এই গুণাবলিগুলোতে ইমান রাখে। এবং তারা ব্রাহ্মণদের অংশীদার আনা আকিদার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

সারকথা

সমস্ত ধর্মই মোটামুটি কমবেশি একত্ববাদের দাবিদার। কিন্তু ইসলাম যে বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ তাওহিদ পেশ করেছে, কোনো জাতিই এমন নিখাদ ও নির্মল তাওহিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কোনো মতবাদ বা ধর্ম দাঁড় করাতে পারেনি এবং পারবেও না। কেউ কেউ তো ইট-পাথরের সামনে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। কেউ আগুন-পানিকে উপাসনার উপযুক্ত মনে করে বসেছে। কেউ নিজের হাতে গড়া দেবীমূর্তিকে প্রয়োজন পূর্ণকারী ও ক্ষতি দূরকারী ভেবে পূজা করছে। কারও কারও বিশ্বাস আল্লাহ তাআলা এতটাই দুর্বল, রুহ ও অণু-পরমাণু ছাড়া তিনি কোনোকিছুই সৃষ্টি করতে এবং এ উপাদানগুলো ধ্বংস করতেও সক্ষম নন। কারও ধারণামতে, একজন মানুষ মানবীয়

সমস্ত গুণাবলি ও তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী শত্রুতাবশত তাদেরই হাতে নিহত হওয়া সত্ত্বেও প্রভু হওয়ার যোগ্য হতে পারে! সুতরাং বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ তাওহিদসংবলিত ধর্মই একমাত্র সত্য ও সঠিক ধর্ম হিসেবে বিবেচ্য হবে। আর যে ধর্ম তাওহিদ ও শিরকের সংমিশ্রণে গঠিত তা প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

শিরকের বাস্তবতা

শিরক যেহেতু তাওহিদের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু, এ কারণে তাওহিদের পরে শিরকের হাকিকত ও বাস্তবতা বর্ণনা করা যুক্তিসংগত বরং একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করছি। কেননা বিপরীত বস্তুর বর্ণনা করার দ্বারা মূল বস্তুর বাস্তবতা খুব ভালোভাবে ফুটে ওঠে।

শিরকের শাব্দিক অর্থ : কাউকে অংশীদার বানানো।

শরয়ি পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার সাথে খাস, অর্থাৎ এককভাবে সম্পৃক্ত এমন কোনো বিশেষ গুণাবলিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। উদাহরণস্বরূপ, অগ্নিপূজকরা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যকে ওয়াজিবুল উজুদ (যে সত্তার একাকী বিদ্যমান ও অস্তিত্বশীল হওয়া আবশ্যক) মনে করে। আল্লাহ তাআলার যেমন জ্ঞান রয়েছে, অন্যকে অনুরূপ জ্ঞানের অধিকারী মনে করা। আল্লাহ তাআলার যেরকম কুদরত, শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে, অন্যকে সেরকম শক্তিসামর্থ্যের অধিকারী ভাবা। যেমন, অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থতা দান করা আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটি গুণ, এ গুণকে তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করা। অথবা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। যেমন পূর্তিপূজকরা মনে করে। ওপরে উল্লেখিত গুণাবলি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। কাজেই কোনো ব্যক্তি এ সিফাতসমূহের মধ্য হতে কোনো একটি সিফাত আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করলে মুশরিক হয়ে যাবে। এবং তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কৃত মনে করা হবে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরক করা ব্যতিরেকে অন্য গুনাহতে যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেন।[৩]

এ ধরনের শিরকের কারণে মানুষ একেবারে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। কুরআন ও হাদিসে লৌকিকতা ও লোক-দেখানোর জন্য নামাজ ও জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে শিরকের ধমকি এসেছে। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নামে কসম দেওয়ার ক্ষেত্রেও শিরকের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এবং কোনো পশুপাখি ইত্যাদির কারণে অশুভ লক্ষণের বিশ্বাস পোষণ করার ক্ষেত্রেও শিরকের শব্দ বর্ণিত হয়েছে। উপর্যুক্ত শিরক দ্বারা মূল শিরক উদ্দেশ্য নয়, যার ওপর ভিত্তি করে কাফির বা মুশরিক হওয়ার বিধান দেওয়া হয়। বরং এই কাজকর্মগুলোর সাথে শিরক ও শিরকি প্রথার সাদৃশ্য থাকার কারণে শিরক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা শরিয়ার উদ্দেশ্য, এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলামে নিকৃষ্ট হারাম ও কুফর-শিরকের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ইত্যাদি বর্ণনা করা। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে মাবুদ মনে করে সিজদা দেওয়া বিশ্বাসগত বা বড় শিরক। এর দ্বারা মানুষ মিল্লাতে মুসলিমা থেকে একেবারে বের হয়ে যায় এবং একে সমস্ত ধর্মের শরিয়তে কুফর বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গাইরুল্লাহকে শুধু সালাম ও সম্মানপ্রদর্শনের নিমিত্তে সিজদা দেওয়া হজরত আদম ও ইয়াকুব আ.-এর শরিয়তে বৈধ ছিল। শরিয়তে মুহাম্মাদিয়াতে একেও তথা শুধু সালাম ও তাজিম প্রদর্শনের জন্য সিজদা দেওয়াকেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাজিমি সিজদা মৌলিকভাবে হারাম হলে, কোনো শরিয়তেই বৈধতা দেওয়া হতো না। কেননা মূল শিরককে কখনো কোনো শরিয়তেই বৈধতা দেওয়া হয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়া যেহেতু পরিপূর্ণ, তাই তাজিমি সিজদাকেও শিরকের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করেই বলা হয়, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করার বিশ্বাস ব্যতিরেকে শুধু সম্মানপ্রদর্শনের জন্য সিজদা করা কর্মগত শিরক, বিশ্বাসগত শিরক নয়। আর মূল শিরক হলো বিশ্বাসগত শিরক, যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে একেবারে বের করে দেয়।

মক্কার মূর্তিপূজকরা এবং হিন্দুরা তাদের অবতার ও মূর্তিগুলোকে সিফাতে ইলম ও কুদরতে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ মনে করত না। তবে এগুলোকে তারা আল্লাহ

---

৩ (সুরা নিসা, ৪৮)

তাআলার প্রভুত্বে অংশীদার মনে করে মুখে খোদা, মাবুদ ও আল্লাহর অংশীদার বলে জ্ঞান করত। যেমনটি কুরআনের এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়,

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا

তারা আল্লাহর জন্য তাদের উৎপাদিত ফসল ও পশুপালের এক অংশ তাদের ধারণামতে নির্ধারণ করে বলে, এ অংশ আল্লাহর জন্য এবং এ অংশ আমাদের দেবতাদের জন্য।[৪]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

তারা আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার নির্ধারণ করেছে।[৫]

وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا

এবং তোমরা আল্লাহ তাআলার জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করেছ।[৬]

এ সমস্ত মূর্তিপূজারির বিশ্বাস ছিল, রাজাবাদশারা যেমন নিজেদের উজির-নাজির ও নৈকট্যশীলদেরকে রাষ্ট্রের গভর্নর-মুখতার নিয়োগ করে, আর তারা প্রজাদের ছোটখাটো সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ ব্যতিরেকে নিজেরাই আঞ্জাম দিয়ে থাকে, এবং তাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুপস্থিতিতে দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়। তবে রাষ্ট্রপ্রধান তা প্রতিহত করতে চাইলে তার আদেশই প্রাধান্যশীল বলে গণ্য হয়ে থাকে। অনুরূপ আহকামুল হাকিমিন রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলাও তাঁর বিশেষ কিছু বান্দাকে স্বীয় প্রভুত্বের সিংহাসনে আরোহণ করিয়েছেন। এবং তাদেরকে স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা দান করে কোনো কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করে দিয়েছেন। কাজেই তারা এ ব্যবস্থাপনা ও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশের অপেক্ষা করে না। কাউকে ক্ষতি ও উপকার পৌঁছানো শুধু

---

৪ (সুরা আনআম, ১৩৬)

৫ (সুরা রাদ, ৩৩)

৬ (সুরা হা-মিম সাজদা, ৯)

আল্লাহ তাআলার ইরাদা ও ইচ্ছাধীন একক কুদরত ও ক্ষমতা নয়। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের কোনো কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে চাইলে তাঁর ইচ্ছাশক্তিই প্রাধান্য পাবে।

সারকথা

শিরকে আকবর তথা বড় শিরক ও শিরকে আসগর তথা ছোট শিরক, অন্য শব্দে বিশ্বাসগত শিরক ও কর্মগত শিরকের মাঝে পার্থক্য নিয়ত ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। কেউ যদি গাইরুল্লাহকে ইবাদতের নিমিত্তে রুকু-সিজদা করে এবং উপাস্য মনে করে তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, তাহলে এটা শিরকে আকবর হবে এবং কুরআনের এই আয়াতে উল্লেখিত,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।[৭]

বিধানটি উদ্দেশ্য হবে। তবে মাবুদ না মনে করে ইবাদতের নিয়ত ব্যতিরেকে শুধু সম্মানস্বরূপ সালাম ও আদব প্রদর্শনের জন্য কাউকে রুকু, সিজদা করলে শিরকে আসগর তথা যে শিরক মুসলিমকে ইসলাম থেকে একেবারে বের করে দেয় না, এ ধরনের শিরক উদ্দেশ্য হবে। আলংকারিকগণ লিখেছেন, বসন্ত সবজি উৎপন্ন করে, এর কথক যদি কোনো নাস্তিক হয়, তাহলে এ বক্তব্য উক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস অনুপাতে ধর্তব্য হবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় শিরকের মৌলিক ভিত্তি নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এই ধরনের শিরক প্রথম প্রকারের শিরকের চেয়ে নিম্ন স্তরের। এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত,

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

---

৭ (সুরা নিসা, ৪৮)

আল্লাহ তাআলা শিরকের গুনাহ ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন।[৮]

মুতাজিলারা বান্দাকে স্বীয় কর্মের স্রষ্টা মনে করে। অথচ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ: إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ

কাদরিয়াগণ (যারা বান্দাকে স্বীয় কাজের স্রষ্টা মনে করে,) হচ্ছে এ উম্মাতের অগ্নিপূজক। সুতরাং তারা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদেরকে দেখতে যাবে না এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না।[৯]

সর্বজনবিদিত মতে মুতাজিলারা এই আকিদা পোষণ করা সত্ত্বেও মিল্লাতে মুসলিমার গণ্ডি থেকে বহিষ্কৃত নয়। কেননা তারা বান্দাকে আল্লাহ তাআলার মতন কাদিরে মুতলাক, একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক ও সবকিছুর একমাত্র কর্মবিধায়ক মনে করে না। এ কারণেই ইসলামি দর্শনশাস্ত্রবিদ ও ফুকাহায়ে কিরামগণ মুতাজিলাদেরকে একেবারে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মনে করেন না। বরং তাদেরকে ইসলামের একটি দল হিসেবেই গণনা করেছেন। বাস্তবিক অর্থে তাদেরকে অগ্নিপূজকদের ন্যায় কাফির-মুশরিক অভিধায় সম্বোধন করেননি। এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে, বান্দা স্বীয় কাজের স্রষ্টা এই শিরকি আকিদাটি অগ্নিপূজকদের আকিদা থেকে নিম্নস্তরের, আর এ শিরক বান্দাকে একেবারে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

---

৮ (সুরা নিসা, ৪৮)

৯ সুনানে আবু দাউদ- ৪৬৯১

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নবুয়ত

ইসলামের মৌলিক দ্বিতীয় ভিত্তিমূল হলো নবুয়ত ও রিসালাত। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ন্যায় নবুয়ত ও রিসালাতকে সত্য মনে করে এর প্রতি ইমান স্থাপন করা ফরজ ও আবশ্যক। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেমন শারীরিক রোগ-ব্যাধি চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সৃষ্টি করেছেন, তেমনই আত্মিক রোগ-ব্যাধি ও অন্তরের কলুষতা বিদূরীকরণের ডাক্তার হিসেবে নবি-রাসুল আ.-কে প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ মানবসমাজের আত্মিক ও অন্তরের রোগ-ব্যাধির সুচিকিৎসা প্রদান করে তাদেরকে সঠিক ও হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। যে-সমস্ত বিষয়াবলি ও বিধিবিধান মানুষের বোধগম্য নয়, সেগুলো অবহিত করেন। মানুষ যদিও স্বীয় বিবেকবুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধ বুঝতে সক্ষম নয়, তবে তাদের মাঝে এতটুকু যোগ্যতা অবশ্যই রয়েছে, কেউ তাদেরকে বাতলে দিলে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কারণ ডাক্তাররা যেমন আমাদেরকে রোগ অবহিত করা ব্যতীত আমরা রোগের প্রকার নির্ণয় করতে পারি না। কিন্তু তারা রোগের প্রকার ও ধরন আমাদেরকে জানানোর পর আমরা রোগের প্রকার উপলব্ধি করতে পারি এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তখন আমাদের রোগের প্রতি বিশ্বাসও জন্ম নেয়। তেমনই নবিগণ আল্লাহ তাআলার বিধানাবলি আদেশ-নিষেধ বাতলে দিলে বান্দারা বুঝতে এবং আয়ত্ত করতে সক্ষম। এখন আমরা ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে পাঠকদের সামনে আলোচনা পেশ করব।

নবুয়তের পদমর্যাদা

আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্বকে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণিবিন্যাসে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকুলের এমন কোনো প্রকার নেই যার সদস্যের মাঝে আল্লাহ তাআলা ভিন্নতা ও পার্থক্য রাখেননি। জড়বস্তুর মাঝে কোনোটি মণি-মুক্তা কোনোটি হিরে-মানিক। বৃক্ষ-তরুলতার মাঝে কোনোটি শাকসবজি কোনোটি গোলাপ ও জাফরান। জীবজন্তুর দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে গাধাও রয়েছে, কুকুরও রয়েছে, ছাগলও রয়েছে হরিণও আছে। যদি মানুষদের কথা বলা হয়, তাদের মাঝেও রয়েছে কারও অন্তর আয়নার মতো স্বচ্ছ ও নির্মল আবার কারও অন্তর লোহা ও পাথরের

মতো কুৎসিত। সূর্যের আলোকরশ্মি লোহা ও আয়না সবকিছুর ওপরই পড়ে। যে অন্তর আয়নার মতো স্বচ্ছ ও নির্মল, তা সূর্যের আলোকরশ্মিকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করে সূর্যের আলোকচ্ছটা নিজের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যে অন্তর আয়না নয় বা আয়না তো বটে, কিন্তু জংমিশ্রিত কালো ময়লাযুক্ত। তাহলে তা সূর্যের আলোকবিম্ব নিজের মধ্যে ধারণ করে কীভাবে প্রকাশ করবে? কাজেই যে আয়না ময়লাযুক্ত, তা নিজের মধ্যে বিদ্যমান ত্রুটির কারণে সূর্যের আলোকবিম্ব প্রকাশ করতে পারে না। আয়না নির্মাতার ত্রুটির কারণে নয়। এভাবেই বুঝে নিতে হবে, আসমান জমিনের নুর মহান আল্লাহ তাআলার আলোকবর্তিকা ও তাজাল্লিয়াত কেবল আয়নাসম স্বচ্ছ পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত ও সব ধরনের আত্মিক জরাজীর্ণতা থেকে পরিশুদ্ধ অন্তরগুলোই গ্রহণ করে তা নিজের মধ্যে প্রতিবিম্ব করার যোগ্যতা রাখে।

সুতরাং আদমসন্তানদের মধ্য হতে যে অন্তরগুলো আয়নার মতো স্বচ্ছ ও নির্মল এবং পশুত্ব ও শয়তানি স্বভাবপ্রকৃতি থেকে মুক্ত, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য হতে কাউকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব দান করার জন্য নির্বাচন করেন। এবং নিজের কালাম ও বিশেষ খেতাবে ভূষিত করে স্বীয় বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধ অবগত করে সম্মানিত করেন। যাতে করে এ পবিত্র আত্মারা তাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পয়গাম ও ওহির বার্তা সাধারণ বান্দাদেরকে পৌঁছানোর মাধ্যমে হিদায়াত, মুক্তি ও সফলতার পথে পরিচালিত করতে পারেন। ধ্বংসাত্মক গুমরাহির প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে মুক্তির সমস্ত পথ ও পন্থা বাতলে দিয়ে তাদেরকে নাজাতের পথে আনতে সক্ষম হন। কাজেই যে-সমস্ত মর্যাদাবান পবিত্র বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীবের রাহনুমার জন্য স্বীয় বিধান ও পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে ইসলামি পরিভাষায় নবি, রাসুল বা পয়গম্বর বলা হয়।

নবি ও নবুয়ত শব্দ দুটি (نَبَأٌ) 'নাবাউন' মূলধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ, খবর বা সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। শরয়ি পরিভাষায়, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিজীবের পথ পদর্শন ও ইলাহি পয়গাম বা সংবাদ পৌঁছানোর জন্য আদেষ্টিত, তাকে নবি বলা হয়।

অন্য শব্দে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে বিশেষ কাজ ও দায়িত্বের জন্য চয়ন করে এমন সব বিধিবিধান বিবেকবান সৃষ্টিকুলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দিয়ে থাকেন যা তাদের দ্বীন-দুনিয়ার সফলতা ও কামিয়াবির সোপান, তাদেরকে নবি বলা হয়। সুতরাং যে পবিত্র বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সংবাদের মাধ্যমে খবর দিয়ে থাকেন, তারাই হলেন নবি। তাদের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধিবিধান ও

আদেশ-নিষেধের নাম নবুয়ত। প্রতিনিধিত্ব ও দূতালির অনুরূপ নবুয়তও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে দান করা হয়। মুহাক্কিক আলিম ইবনু আমির আলহাজ রহ. *শরহু তাহরিরিল উসুল*[১০] গ্রন্থের এক নম্বর খণ্ডের সাত পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

> قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: أَجْمَعُ الْأَقْوَالِ الشَّارِحَةِ لِلرِّسَالَةِ الْإِلَهِيَّةِ أَنَّهَا سِفَارَةٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ تُنَبِّهُ أُولِي الْأَلْبَابِ عَلَى مَا تَقْصُرُ عَنْهُ عُقُولُهُمْ مِنْ صِفَاتِ مَعْبُودِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، وَمَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَمُسْتَحِثَّاتٌ تُهْدِيهِمْ وَدَوَافِعُ شُبَهِ تُرْدِيهِمْ.

কিছু গবেষক বলেন, নবুয়ত ও রিসালাতের সব থেকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা হলো, আল্লাহ ও সৃষ্টিজীবের মাঝে বন্ধন তৈরিকারী দূতালি পদমর্যাদার নাম নবুয়ত ও রিসালাত। অর্থাৎ নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে বিবেকবানদেরকে এমন সমস্ত বিধানাবলি অবহিত করেন, যা বিবেকবুদ্ধি বুঝতে ও অনুধাবন করতে অক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, তারা বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলার সিফাত ও গুণাবলির পরিপূর্ণতা ও মানুষের মৃত্যুপরবর্তী বিভিন্ন বিষয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে অবহিত করেন। আর নসিহা, হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করে ধ্বংসাত্মক সন্দেহ-সংশয় নিরসন করে সঠিক পথের দিশা দেন।

ফায়দা: হজরত আম্বিয়া কিরাম আ. যদিও এমন কিছু বিষয়াবলির বর্ণনা দিয়ে থাকেন যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, কিন্তু এই সাধারণ লোকদের মাঝে এতটুকু যোগ্যতা তো অবশ্যই রয়েছে, কেউ বাতলে দিলে তারা তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। এর দৃষ্টান্ত, ডাক্তার বলে দেওয়া ব্যতীত যেমন রোগের প্রকার নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ডাক্তার যখন বলে দেয় তা অনায়াসে বুঝে আসে এবং অন্তর বিনা বাক্যে বিশ্বাস করে মেনে নেয়।

কোনো কোনো আলিম বলেন, নবুয়তের অর্থ সুউচ্চ বা মর্যাদাবান হওয়া। সুতরাং যিনি আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন তাকে নবি

---

১০ গ্রন্থটির মূল আরবি নাম, *আত-তাকরির ওয়াত-তাহরির আলা তাহরিরি কামাল ইবনিল হুমাম*।

বলা হয়। নবিগণ পৃথিবীর কারও থেকে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করা ব্যতিরেকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করেন যা বিবেকবুদ্ধি দ্বারা অর্জন করা শুধু অসম্ভবই নয়, বরং অবাস্তবও বটে। চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে এ জ্ঞান অর্জন করা যায় না। অতঃপর প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়, 'আমার দরবার থেকে সময়ে সময়ে তোমাদের নিকট যে আদেশ-প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে তা আমার বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেবে।' কাজেই যিনি আল্লাহ তাআলার বাণী ও আদেশ বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেন তিনিই হলেন নবি। এই আজিমুশ শান দায়িত্ব ও অতি উচ্চ পদমর্যাদার নাম নবুয়ত বা রিসালাত। অকাট্যভাবে প্রমাণিত মহামহীয়ান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দূতালি ও প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে বড় কোনো দায়িত্ব ও পদমর্যাদা হতে পারে না। আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমত দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষায়িত করেন। এ পদমর্যাদা এত উচ্চমানের যে, এর সামনে সাত ভূখণ্ডের বাদশাহিও ঢের তুচ্ছ। তাই ইসলামের সমস্ত আলিমের ঐকমত্যে নবুয়ত আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী পদমর্যাদা, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এর মুকুট পরিয়ে নবুয়তের সিংহাসনে আসীন করেন।

দার্শনিকদের মতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ধ্যান-সাধনার মাধ্যমেও নবুয়ত অর্জন হতে পারে। তাদের নিকট নবুয়ত সাধনালব্ধ বস্তু। আর সত্যপন্থী আলিমদের নিকট নবুয়ত আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়, কোনো ব্যক্তি যতই যোগ্য ও উপযুক্ত হোক না কেন, শুধু যোগ্যতা দ্বারা আপনা-আপনিই দূত ও বার্তাবাহক হতে পারে না, যতক্ষণ না বাদশাহ কাউকে নিজ আদেশে নায়েব, দূত বা বার্তাবাহক নির্ধারণ করেন। দায়িত্ব ও পদমর্যাদার জন্য বাদশাহর আদেশ আবশ্যক, শুধু যোগ্যতা যথেষ্ট নয়।

নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য

কোনো কোনো আলিমের মতে নবি ও রাসুলের মাঝে কোনো তফাত নেই। এ দুটি শব্দের ব্যবহার একই অর্থে প্রয়োগ হয়। তবে বিদগ্ধ গবেষক আলিমগণ নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। এবং জমহুরদের মাজহাবও এটি। 'নবি' (نَبِيٌّ) একটি ব্যাপক শব্দ আর 'রাসুল' (رَسُوْلٌ) খাস তথা বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থে নির্ধারিত একটি শব্দ। যার নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয় এবং যিনি সৃষ্টিজীবের পথপ্রদর্শন ও আল্লাহর ঐশী বিধান প্রচারে আদেষ্টিত তাকে নবি বলা হয়। এ ছাড়াও যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য যেমন, নতুন কিতাব বা নতুন শরিয়া অথবা নতুন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়, তাকে রাসুল বলা হয়। যেমন, হজরত ইসমাইল আ.-কে নতুন শরিয়া দেওয়া হয়নি, বরং তিনি হজরত ইবরাহিম আ.-এর শরিয়া অনুযায়ী আমল করতেন, কিন্তু তাকে নতুন সম্প্রদায় তথা জুরহুম জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। অথবা কোনো মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করে যাকে প্রেরণ করা হয়, তাকে নবি রাসুল বা রাসুল নবি বলা হয়। প্রত্যেক নবিকে আল্লাহ তাআলা ওহি ও ফেরেশতাদের অবতরণে সম্মানিত করে থাকেন। আর সকল নবিকে এ পরিমাণ মুজিজা দান করা হয় যা দ্বারা তাদের নবুয়ত ও পয়গম্বরি প্রমাণিত হয়ে যায়। তবে এ ছাড়াও কোনো কোনো নবিকে আরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করা হয় যেমন, হজরত আদম আ.-কে আল্লাহ তাআলা গঠনাকৃতিবিহীন নিজের দস্ত মুবারক দ্বারা সৃষ্টি করে স্বীয় খলিফা বানিয়ে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদাপ্রাপ্তির মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। হজরত ইবরাহিম আ.-কে খলিলুল্লাহ, হজরত মুসা আ.-কে কালিমুল্লাহ ইত্যাদি ইত্যাদি মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সুতরাং হজরত আম্বিয়া কিরাম আ.-এর মধ্য হতে যাদেরকে ওহি ও মুজিজা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করা হয়, তাদেরকে নবি রাসুল বা রাসুল নবি বলা হয়।

নবি-রাসুলদের প্রয়োজনীয়তা

একদল স্বাধীনচেতা লেখক আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও তাদের মুক্তিকামী স্বাধীন ধ্যানধারণা পোষণ করতে দ্বিধা করে না। তারা নিজেদের বিদ্যমানতাকে বস্তু ও বস্তুনিচয়ের চিরন্তন নড়াচড়ার বন্ধকি সনির্বন্ধ বস্তু বলে জ্ঞান করে। বরং তারা আল্লাহ তাআলাকেই অস্বীকার করে।

দ্বিতীয় আরেকটি দল আল্লাহ তাআলার সত্তাকে স্বীকার করে এবং আখিরাতের কিছু বিষয়ে বিশ্বাসও রাখে। কিন্তু তাদের মৌলিক বিশ্বাস শুধু আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট। তাই আম্বিয়া কিরাম আ. ও তাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে তারা নারাজ। তাদের মধ্যে কিছু লোকের বিবেক এতটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ যে, তারা মনে করে আমরা যেমন স্বীয় বিবেকবুদ্ধি দ্বারা জড়-পদার্থ ও বস্তুবাদের বিশ্লেষণ করতে পারি, তেমনই আমাদের মস্তিস্কপ্রসূত নীতি দ্বারা রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতারও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করতে পারব। শাস্ত্রাজ্ঞ কোনো পথপ্রদর্শক ও শিক্ষকের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাদীক্ষায় নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে উক্ত শাস্ত্রাভিজ্ঞদের উপেক্ষা করা তাদের জ্ঞানের প্রথম ও প্রধান পদস্খলন। অথচ তারা জড়বাদ ও বস্তুবাদের ক্ষেত্রে শাস্ত্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের থেকে সামান্যও অমুখাপেক্ষী নয়। তারা বুঝতে পারে না, শরীরের জন্য যেমন শারীরিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়, তেমনই আত্মিক বিষয়ের জন্য আধ্যাত্মিকতায় অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়। এই নির্বোধদের এতটুকুও অনুভূতি নেই, রুহ ব্যতীত শরীর অবশিষ্ট থাকতে পারে না। রুহ ও শরীরের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু, শরীর দৃশ্যমান আর রুহ অদৃশ্য। এই আকাট মূর্খের দলেরা ইসলামি গ্রন্থাদিকে অলীক কল্পকাহিনি ও প্রাচীন দস্তাবেজ জ্ঞান করে। অথচ তারা পূর্বেকার দার্শনিক ও সায়েন্টিস্টদের পৌরাণিক নথিপত্তর ও দস্তাবেজ অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে রাখে। এগুলোর ব্যাপারে তাদের কখনো ধারণা সৃষ্টি হয় না, এখনকার সাথে আগেকার সায়েন্সের ঢের তফাত সাধিত হয়েছে, কাজেই প্রাচীন সব নথিপত্তর ও মতামত সমুদ্দুরে নিক্ষেপ করতে হবে। এখন আমাদের এই পৌরাণিক দস্তাবেজের কোনো প্রয়োজন নেই, এ কথা তারা মোটেও বলে না।

কোনো ব্যক্তি যত বড় বিদ্বান, যোগ্যতাসম্পন্ন ও যতই উপযুক্ত হোক না কেন, পূর্ববর্তী দার্শনিক ও সায়েন্টিস্টদের দ্বারস্থ হওয়া এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রগণ্যতা মেনে নেওয়া ব্যতীত এ পথে এক কদমও চলতে পারবে না। যে পন্থায় তারা এ পথে কদম বাড়িয়ে সামনে আগ্রসর হয়েছেন, পরবর্তীদের সে পন্থাতেই তাদের পথে চলে এ ময়দানে অগ্রসর হতে হবে। তাদের পথপ্রদর্শন ও মৌলিক মূলনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ ব্যতীত এ পথে সফলতা অর্জন করা অলীক বইকি।

নসখ তথা রহিতকরণের বাস্তবতা

মূলনীতির কখনো হেরফের ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না। কিন্তু তাজরিবা ও অভিজ্ঞতা রদবদল হতেই থাকে। পঞ্জিকার মূলনীতি একই থাকে, কিন্তু তারিখ প্রত্যেক বছর পরিবর্তিত হয়। শরিয়তে মুহাম্মাদি সর্বশেষ শরিয়া হওয়ার কারণে পঞ্জিকার মূলনীতির ন্যায় সর্বদা একইরকম থাকবে, এতে কোনো পরিবর্তন সাধিত হবে না।

ইসলামি শরিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রকৌশলবিদ্যার ন্যায় পরিপূর্ণতার চরম উৎকর্ষে পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে ভুল শুধু নিজের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে হয়ে থাকে। বর্তমান সায়েন্স প্রকৌশলবিদ্যায় অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নতি সাধন করেছে বটে, কিন্তু মূলনীতির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে মোটেও সক্ষম হয়নি। প্রকৌশলবিদ্যার দাবিদাওয়া প্রমাণিত করা এবং তা অনুভূতিনির্ভর বোঝানোর জন্য সায়েন্স বিভিন্ন যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি আবিষ্কার করেছে, কিন্তু এ উন্নতি দ্বারা মৌলিক মূলনীতির উন্নতি হয়নি, বরং অনুভূতিগত অভিজ্ঞতায় সংযোজন হয়েছে মাত্র। অথবা বলা যায় বিবেকের দর্পণ থেকে বোঝা হালকা হয়ে সমস্ত বোঝা বাহ্যিক অনুভূতিতে ছিটকে পড়ে বস্তুবাদের উন্নতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি রসাতলে যেতেই থাকছে।

ইহুদিরা নসখ তথা রহিতকরণকে অসম্ভব মনে করে। ইহুদিদের মতে নসখ হলো, কোনো আদেশ আজ্ঞাবহ হওয়ার পর তাতে ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণে

পুনরায় সংশোধন করে দেওয়া। অথবা কোনো বিধান একেবারেই মিটিয়ে দিয়ে তদস্থলে উপযোগী কোনো বিধান প্রণয়ন করে কার্যকর করার নাম নসখ। গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে, এই ধরনের রহিতকরণকে আমরাও অসম্ভব মনে করি। কিন্তু আমরা যে নসখের কথা বলি তা শুধু বিধানের পরিবর্তন মাত্র। অর্থাৎ কোনো বিধান প্রণয়ন করে পূর্বেকার আদেষ্টিত উক্ত বিধানের ওপর কিছুকাল আমল চলার পর বিচারক কোনো কল্যাণের কারণে উক্ত বিধানে অন্য বিধানের পরিবর্তন ঘটায়, এর নামই হলো নসখ তথা রহিতকরণ। বিধান প্রণয়নকারীর জ্ঞানে ছিল এ বিধানটি কিছুকালের জন্য কার্যকর থাকবে, কিন্তু আদেষ্টিতদের খবর ছিল না, বিধানদাতার জ্ঞানে উক্ত বিধানের সময়সীমা কী পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং যখন উক্ত সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে, তখন তদস্থলে কোনো অন্য বিধান কার্যকর করা হবে। সুতরাং এমন হওয়াটা অসম্ভব নয়, বরং সম্ভব হওয়ার হাজারো দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে।

রাজা-নৃপতিদের বিধিমালায় ও ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়া নিত্যদিনের কাজে পরিণত হয়েছে। ইহুদিরা রহিতকরণ অসম্ভব হওয়ার দাবি করেছে বটে, কিন্তু তাদের নিকট রহিতকরণ অসম্ভব হওয়ার কোনো দলিল নেই। ইসলামধর্মের প্রতি প্রতারণা ও একঘেয়েমির কারণে তাদের মস্তিষ্ক এ কৌশল ও মতামত প্রসব করেছে।

নবিদের আগমনের প্রয়োজনীয়তা

বিবেক এ কথাই বলে, যে প্রভু আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তাঁর সঠিক পরিচয়, আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি কামনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের ওপর আবশ্যক। কিন্তু তাঁর সঠিক পরিচয় ও আনুগত্যের পদ্ধতি এবং শুকরিয়া আদায়ের সঠিক পন্থা তিনি অবহিত করা ব্যতীত অবগত হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণত পৃথিবীর কোনো রূপক শাসকের বিধিনিষেধ প্রতিনিধি ব্যতিরেকে অবগত হওয়া সম্ভবপর হয় না, তাহলে আহকামুল হাকিমিন রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান মাধ্যম ছাড়া কীভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হতে পারে? কাজেই বিধিবিধান অবগত করার জন্য আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতা থাকা আবশ্যক। আর একেই শরিয়ার পরিভাষায় নবি বা রাসুল বলা হয়।

মানুষের বিবেকবুদ্ধি একে অন্যের থেকে ভিন্ন ও আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেউ কোনো কাজ ভালো মনে করে, কেউ উক্ত একই কাজকে খারাপ সাব্যস্ত করে। কেউ পাথর, পাহাড়কে উপাস্য মনে করে পূজা করে এগুলোকে আখিরাতে নাজাতের মাধ্যম জ্ঞান করে। কেউ একে কুফর-শিরক ও ভ্রষ্টতার মূল এবং ধ্বংসাত্মক গুনাহ সাব্যস্ত করে পরিত্যাগ করে। আল্লাহ তাআলা এ মতভিন্নতার অবসান ঘটানো এবং সমস্ত মানবজাতিকে একটি সঠিক কেন্দ্রস্থলে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নবিদেরকে পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন।

যদি হজরত আম্বিয়া আ. প্রেরিত না হতেন, তাহলে পৃথিবী থেকে ভালো-মন্দ, ইমান-কুফর ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য উবে যেত। যে-সমস্ত লোক গাল ফুলিয়ে বলে, ইমান আর কুফর আবার কী জিনিস? তাদের এ বক্তব্য সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য আবার কোন জিনিস এ ধরনের প্রশ্নের মতন। এ ধরনের লোকেরা বলে, বরং আমরা তো আমাদের যার যেমন সুবিধে সে তেমন চলব! আমাদের কোনো নবি-রাসুলের প্রয়োজন নেই!

কোনো রাষ্ট্রের মানুষ যত বড়ই বিদ্বান আর বিবেকবান হোক না কেন, রাষ্ট্রপ্রধান তাদেরকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও নিজেদের খেয়ালখুশির ওপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেন না। বরং তাদের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে বাস্তবায়িত করেন। কোনো রাজ্যের অধিবাসীই এই দাবি করে বলেনি, আমাদের কোনো রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। বরং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে

নিয়ামতস্বরূপ যে বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। কোনো নিয়মনীতি, বিধিনিষেধের আমাদের আর প্রয়োজন নেই।

পৃথিবীতে অরাজকতার মূল কারণ প্রবৃত্তির অবাধ্যতা ও খাহেশাতের অন্ধ অনুকরণ

জগদবাসীর পরিশুদ্ধকরণ একমাত্র আম্বিয়া আ. ও তাদের আনীত শরিয়া দ্বারাই সম্ভব। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

হক তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে অবশ্যই আসমান জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা-কিছু রয়েছে বিধ্বস্ত হয়ে যেত।[১১]

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

এবং আপনি অজ্ঞদের খাহেশাত অনুকরণ করবেন না। [১২]

এ কারণে নবিদের অনর্থক বিষয়াবলি থেকে পবিত্র হওয়াও আবশ্যক। কেননা মৌলিকভাবে কোনো অন্তর প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের চাহিদার আনুগত্যে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এমনকি স্বয়ং প্রবৃত্তিও স্বীয় প্রবৃত্তির আনুগত্য করতে প্রস্তুত নয়, বরং অপ্রবৃত্তির আনুগত্যের ওপর প্রবৃত্তিই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে।

দ্বিতীয় দলিল

প্রজারা শাসক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এতটা প্রয়োজনীয় মনে করে না, যতটা না বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য ও তাঁর প্রণীত জীবনব্যবস্থা ও শরিয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বান্দা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কখনোই জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু প্রজারা শাসক ও রাষ্ট্রীয় হুকুমত এবং শাসনব্যবস্থা ছাড়াও জীবিত থাকতে পারে। আমেরিকাতে যেমন পাঁচশত বছর পূর্বে রাষ্ট্রীয় কোনো শাসনব্যবস্থা

---

১১ (সুরা মুমিনুন, ৭১)

১২ (সুরা জাছিয়া, ১৮)

না থাকা সত্ত্বেও মানুষ জীবিত ছিল। ইসলামি শাসন ও জীবনব্যবস্থা আমেরিকার প্রকাশ ও অস্তিত্ব লাভের সাতশ বছর পূর্বে থেকেই বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীতে তা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করেছিল। ইউরোপবিশ্ব ইসলামি আইনশাস্ত্র সামনে রেখেই তাদের আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করেছে। এ বিষয়ে তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিকগণ ও ইসলামি দর্শনশাস্ত্রবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। আসসোস আর আসসোস আমাদের সুশীল সমাজ ও রৌশন বিদ্যাপতি খ্যাত কথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি! তারা জিজ্ঞেস করে ইসলামে কি কোনো রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে? যদি থেকেও থাকে এ ধরনের সেকেলে নিয়মনীতি দ্বারা কি আর এ কালের দেশশাসন, রাষ্ট্রপরিচালনা করা যায়? অধম লেখক বলেন, সঠিক রাষ্ট্রপরিচালনা ও ন্যায়ভিত্তিক জীবনব্যবস্থার বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা সেটিই যা ইসলাম বাতলে দিয়েছে। কারও যদি এ বিষয়ে দ্বিমত থাকে, সে যেন উলামায়ে ইসলামের সাথে এ নিয়ে বাত-বচসায় অবতীর্ণ হয়। অথবা আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর তুলনামূলক আলোচনার জন্য কনফারেন্সের ডাক দেয়। সারকথা, মানুষ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়াবলিতে আল্লাহ তাআলার প্রতি সীমাহীন মুহতাজ, যার সামনে পৃথিবীর রাজাবাদশা ও তাদের রাজ্য ও শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন তুলনায় অতি সামান্যও হতে পারে না।

ওহি ও ইলহাম

ওহির শাব্দিক অর্থ, ইশারা বা ইঙ্গিত করা। অথবা এমন গোপন কথা যার মধ্যে বাহ্যিক অনুভব-অনুভূতির কোনো দখলদারি নেই। ইলহাম অর্থ, অন্তরে কোনো বস্তু ঢেলে দেওয়া বা নির্দেশ করা। শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে ওহি ও ইলহামের অর্থ প্রায় কাছাকাছি। উক্ত অর্থ অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনো সৃষ্টিজীব নেই যা ওহি ও ইলহামের ফয়েজ ও বরকত অর্জন করেনি। জড়পদার্থ, বৃক্ষ-তরুলতা, জীবজন্তু, জিন-ইনসান ও ফেরেশতা সকলেই তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো না কোনো প্রত্যাদেশ ও ইলহাম পেয়ে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে মর্যাদা ও স্তরভেদে পার্থক্য সাধিত হয়ে উক্ত স্তর অনুপাতে ইলহাম হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিজীবের নিকটেই স্বীয় স্তরভেদ অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তা সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকাজ ও নেক কাজের জ্ঞান দান করেছেন।[১৩]

أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

তিনি প্রত্যেক বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।[১৪]

অর্থাৎ তিনি প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টিজীবের অন্তরে কোনো বস্তু ঢেলে দেন এবং আদেশ করেন।

কবি বলেন,

এ তো ধারণা ও প্রকৃতির চেনা দৃশ্য নয়,

এ যে মানবমনে বুনে দেওয়া রবের পরিচয়।

সবার সাথেই রয়েছে তোমার অদেখা এক বাঁধন

সকল মনের গভীরে তুমি চেনা আপনজন।

অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টিজীবের সাথেই সৃষ্টিকর্তার গোপন সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে।

জড়পদার্থ ও বৃক্ষ-তরুলতার নিকট ইলহাম হয় তোমরা বাড়তে থাকো। আর বস্তুপূজারি দার্শনিক ও নাস্তিকরা বলে এ বাড়াটাই হলো বস্তুর নড়াচড়া। আল্লাহ পূজারিগণ বলেন, স্পন্দনকারী ব্যতীত কোনো বস্তু বাড়তে পারে না এবং নড়াচড়া করার ক্ষমতা রাখে না। মৌমাছির নিকট প্রত্যাদেশ হয়, তুমি অমুক অমুক গাছের ফুল থেকে রস চুষে এনে মধু তৈরি করো। কুরআন বলে,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

আপনার প্রভু মৌমাছির অন্তরে ঢেলে দিলেন, তোমরা পাহাড়কে বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করো (মধু সংগ্রহের জন্য)।[১৫]

---

১৩ (সুরা শামস, ৭-৮)

১৪ (সুরা তহা, ৫০)

১৫ (সুরা নাহল, ৬৮)

জীবজন্তুর নিকট ইলহাম হওয়ার প্রমাণ, তারা তাদের জন্য উপকারী ও অনুপকারী উদ্ভিদ-তরুলতাকে খুব ভালো করেই চেনে। সাধারণ মানুষের মাঝেও ইলহামের ধারাবাহিকতা জারি রয়েছে। কেননা সদ্যভূমিষ্ঠ দুগ্ধপোষ্য শিশু নিজের মা কে ও স্তন কীভাবে চুষে পান করতে হবে আপনা-আপনিই জানতে পারে। আর এটা শুধু ইলহামের মাধ্যমেই অবগত হওয়া সম্ভব। অন্তরে হঠাৎ কোনো বস্তু উদয় হওয়া ইলহামের দিকেই ইঙ্গিত করে। সাধারণ কোনো মানুষের হৃদয়ে আকস্মিক কোনো অসাধারণ জিনিসের উপস্থিতি ইলহামের অর্থই বহন করে।

শরয়ি পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে অথবা ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতিরেকে নবি আ.-এর নিকট অবতীর্ণ পয়গাম বা কালামকে ওহি বলে।

আমাদের ক্রিয়াশীল অন্তর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যে আদেশ দেয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তা মান্য করে। কেননা শরীরের সবকিছুই অন্তরের ক্রিয়াশীলতার অধীনস্থ হয়ে রয়েছে। অন্তরই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের অপূর্ণতার দরুন আমরা আমাদের ক্রিয়াশীল অন্তরের কথা ও আদেশ-নিষেধের বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারি না। কিন্তু এ অস্পষ্টতা সত্ত্বেও আমরা এটুকু বুঝতে সক্ষম হই, ক্রিয়াশীল অন্তরের সাথে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ এক সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই অন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর আদেশ জারি করে এখন এ কাজ করো, এ কাজ থেকে বিরত থাকো। আমরা এও জানতে পারি, ক্রিয়াশীল অন্তর অভ্যন্তরীণভাবে অবশ্যই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে যোগসূত্র কায়েম রেখে কথা বলে, আদেশ-নিষেধ এবং সম্বোধন করে থাকে যা অক্ষর, শব্দ ও আওয়াজ থেকে মুক্ত। সুতরাং ক্রিয়াশীল অন্তর যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে আদেশ-নিষেধ কার্যকর করে থাকে, তেমনই জগতের সবকিছু আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বের অধীনে থাকার কারণে তিনিও অভ্যন্তরীণভাবে সকল বস্তুর ওপর স্বীয় হুকুম বাস্তবায়ন করে এ কাজ করতে ও অমুক কাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া কারও জন্যই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার এই অভ্যন্তরীণ বাণী ও পয়গামের নামই হলো ওহি। ওহি জাতিসত্তা হিসেবে জগতের সমস্ত বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে। তবে তা প্রকার ও শ্রেণিভেদের স্তর অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে মৌমাছি ও মাকড়সার ক্ষেত্রেও ওহি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মৌমাছি ও মাকড়সার ওপরও স্বীয় স্তর অনুযায়ী ওহি অবতরণ করা হয়। জাতিসত্তা হিসেবে ফেরেশতাদের নিকটও ওহি আসে, শয়তান ও জিনদের ওপরও প্রত্যাদেশ হয়। কিন্তু উভয়টির মাঝে আকাশ-

পাতালের সম্পর্ক রয়েছে। নবি আ.-এর নিকটও ওহি অবতীর্ণ হয়, গণক ও দাজ্জালদের নিকটও ওহি আসে। কিন্তু উভয়টির মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। নবিদের ওপর অধিকাংশ সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে ওহি অবতীর্ণ করা হয়। যেমন কুরআনে এসেছে,

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

আপনার অন্তরে ওহি নিয়ে অবতীর্ণ হয় রুহুল আমিন জিবরিল, যাতে করে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।[১৬]

গণক ও দাজ্জালদের নিকট ওহি নিয়ে আসে শয়তান। কুরআন বলে,

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ

নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহি পাঠায়।[১৭]

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ

আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো, কাদের ওপর শয়তান সওয়ার হয়।[১৮]

ওহি শব্দটি যদিও জাতিসত্তা হিসেবে ব্যাপক অর্থবহ হওয়ার দরুন মানুষ, জিন, শয়তান ও ফেরেশতা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো সম্মানিত বান্দার ওপর অবতীর্ণ কালামকেই শুধু ওহি বলা হয়। যেমন, কালাম শব্দটি শাব্দিক অর্থে জীবজন্তুর বুলির ওপরও প্রয়োগ হয়, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে শুধু মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক শব্দকেই কালাম বলা হয়।

বর্তমান সায়েন্স বাহ্যিক ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্য করণার্থে বিভিন্ন অভিনব যন্ত্রাদি আবিষ্কার করেছে। মূল্যবান দুরবিন (telescope) আবিষ্কার করে অনেক দূরের বস্তু চোখের সন্নিকটে এনে দিয়েছে। এমনকি আসমানের তারকারাজি ও এগুলোর নড়াচড়াও এর সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। অণুবীক্ষণ (microscope) যন্ত্র আবিষ্কার

---

১৬ (সুরা শুআরা, ১৯৩-১৯৪)

১৭ (সুরা আনআম, ১২১)

১৮ (সুরা শুআরা, ২২১)

করে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব করে দিয়েছে। এমনকি চোখের জ্যোতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এমন সব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যার সাহায্যে খালি চোখে দেখা অসম্ভব এমন শরীরবিশিষ্ট বস্তুর সীমা পার করে এর পেছনের জিনিস পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হওয়া সহজ করে দিয়েছে। সেসব আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি দ্বারা সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত বস্তু পর্যন্ত চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শ্রবণশক্তির পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করে শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি করেছে।

কথা, আওয়াজ ও শব্দ সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সমস্ত নব আবিষ্কার বস্তুবাদের সাথে সম্পৃক্ত, যা স্বল্পতার সীমা পেরিয়েছে মাত্র। জানা নেই অদূর ভবিষ্যতে আরও কী কী ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করা হবে।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই যখন ইন্দ্রিয়জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের উপায়-উপকরণ সীমাবদ্ধ নয়, তাহলে অধ্যাত্ম জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ হওয়ার মত পেশ করা কীভাবে সঠিক হতে পারে? এর থেকেও বড় মূর্খতা ও আহম্মকি হবে, যদি অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমকে অনুভূতিগত জ্ঞানের উপায়-উপকরণের অনুরূপ মনে করা হয়। ওহে প্রিয় বন্ধুগণ! একজন মানুষ যদি এমন যন্ত্রাদি আবিষ্কার করতে পারে, যা মানুষের বাহ্যিক অনুভূতিগত বস্তু উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক ও মদদগার হয়, তাহলে কি অসীম শক্তির আধার আল্লাহ তাআলা নিজের কোনো সম্মানিত বান্দাকে এমন আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দান করতে পারেন না, যার সাহায্যে সে শরীরহীন বস্তু দেখতে পারেন যা অন্যদের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং যা অন্যরা শুনতে পারে না তা তিনি শুনতে পারেন?

নবুয়তের প্রামাণ্যতা

আল্লাহ তাআলা কাউকে নবুয়তের সম্মানে ভূষিত করতে চাইলে সৃষ্টির শুরু থেকেই তার অবস্থা, তথা বিবেকবুদ্ধি, বুঝ-সমঝ, চরিত্র ও আচারবিধি এবং জন্মগত স্বভাবজাত গুণাবলি অত্যন্ত প্রশংসিত ও পছন্দনীয় করে সৃষ্টি করেন। যাতে করে তাকে সকল মানুষ থেকে ভিন্নতর ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দেখায়। নবুয়তের দায়িত্ব দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত সম্মানিত বান্দাদের থেকে সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী এমন অলৌকিক বিষয়াবলি সংঘটিত করেন, যা মানবীয় শক্তিসীমার পরিধির একেবারেই বহির্ভূত।

যেমন, হজরত ইবরাহিম আ.-এর জন্য আগুন আরামদায়ক শীতল হয়ে যাওয়া, হজরত মুসা আ.-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া, হজরত ঈসা আ.-এর মৃতদের শরীরে হাত বুলিয়ে দেওয়ার দ্বারা জীবিত হয়ে যাওয়া এবং জন্মান্ধদের দৃষ্টি ফিরে পাওয়া ও আমাদের নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙুল মুবারকের ইশারায় আসমানের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি (এই সমস্ত কার্যাবলিকে মুজিজা বলা হয়)।

মুজিজা হজরত আম্বিয়া কিরাম আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত প্রমাণিত হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল ও তাদের সত্যতা প্রমাণের চাক্ষুষ সাক্ষী হয়ে থাকে। নবিদের হাতে প্রকাশিত অলৌকিক বিষয়াবলি দেখে মানুষ বিশ্বাস করে নেয়, এ সমস্ত লোক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বান্দা। তাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন কুদরতি কারিশমা তাদের হাতে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা প্রকাশ করতে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি অক্ষম। তবে মিথ্যাবাদী ও ধুরন্ধর চক্রান্তকারীদের জন্য অদৃশ্য থেকে এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাবলি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য স্বাভাবিকভাবে প্রলুব্ধ হয় না, এ কারণে আল্লাহ তাআলা হজরত আম্বিয়া আ.-কে অপ্রতিরোধ্য অলৌকিক ঘটনাবলিসমেত প্রেরণ করেছেন। এইসব দেখে মানুষের গরদান যেন অবনত হয়ে যায় এবং তারা বুঝে নেয় এ মুজিজা আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তির নিদর্শন, সুতরাং কারও তা প্রতিহত করার ক্ষমতা নেই। এ ধরনের সাধারণ নিয়ম পরিপন্থী অনভিপ্রেত ঘটনাবলিকে কুরআনের ভাষায় اَلْبَرَاْهِيْنُ 'আল-বারাহিন' (অকাট্য দলিল) ও الأيات البينات

'আল-আয়াতুল বাইয়িনাত' (সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নিদর্শনাবলি) বলে নামকরণ করা হয়েছে। হাদিস বিশারদগণ একে 'দালায়িলুন নবুওয়া' (নবুয়তের দলিলসমূহ) আর ধর্মতত্ত্ববিদগণ একে 'মুজিজা' নামে নামকরণ করেছেন।

মুজিজার বাস্তবতা

প্রথমে আমরা মুজিজার বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করব। এরপর মুজিজা নিয়ে যেসব সন্দেহ-সংশয় রয়েছে তা অপনোদনের প্রয়াস চালাব। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে উপায়-উপকরণের জগৎ বানিয়েছেন। তাই প্রত্যেক বস্তুকে কোনো কারণ সংঘটিত করার পরে সৃষ্টি করেন। কিন্তু কখনো কখনো নবিদের হাতে কোনো কারণ ও উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে শুধু স্বীয় কুদরত দ্বারা অলৌকিক বিষয়াবলি প্রকাশ করেন। অলৌকিক বিষয়াবলি দেখে মানুষ যেন বুঝতে পারে, আল্লাহ তাআলা অসীম কুদরতের অধিকারী এবং নবিদের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যাতে তা অবলোকন করে এই বিশেষ বান্দাদের মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টায় সচেষ্ট থাকে। মুজিজা (مُعْجِزَةٌ) শব্দটি 'আল-ইজাজ' (اَلْإِعْجَازُ) শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ, অক্ষম করে দেওয়া, অর্থাৎ যে বিষয়াবলি নবিদের হাতে প্রকাশ পায় তা মানবীয় শক্তিসামর্থ্যকে প্রকাশ করতে অক্ষম করে দেয়। অলৌকিক বিষয়াবলি দেখার সাথে সাথে মানুষ বুঝতে পারে তা আল্লাহ তাআলার কুদরতের কারিশমা, যা মানুষের সাধ্য ও ক্ষমতা থেকে বহুগুণ ঊর্ধ্বের। আর যে কাজ মানুষের সাধ্যের বাইরে তা আবশ্যকীয়ভাবে আল্লাহ তাআলার কাজ হিসেবে গণ্য হয়। আল্লাহ ও মানুষের কার্যাবলির মাঝে পার্থক্য পরিমিত হওয়ার এটাই পদ্ধতি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মুজিজা যদিও নবিদের হাতে প্রকাশিত হয়, বস্তুত তা আল্লাহ তাআলার কাজ। এ কারণে কুরআনে এসেছে,

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

আপনি যখন নিক্ষেপ করেছেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহ তাআলাই নিক্ষেপ করেছেন।[১৯]

এদিকে লক্ষ করেই কুরআনে কারিমে জায়গায় জায়গায় মুজিজাকে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন, 'আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের বুক চিরে রাস্তা বানিয়েছেন', 'আগুনকে আরামদায়ক ঠান্ডা করেছেন'। উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয়, মুজিজা কোনো কারণ বা উপায়-উপকরণের সৃষ্ট ফলাফল নয়। বরং সরাসরি আল্লাহ তাআলার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং নিতান্তই তাঁর কর্মের ফলাফল, যা কোনো কারণ সংঘটিত ও প্রকাশ হওয়া ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয়েছে। খ্রিষ্টানরা হজরত ঈসা আ.-এর মুজিজাকে তার সত্তাগত কাজ ভেবে তাকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

হজরত ঈসা আ.-এর মুজিজাসমূহ মুসলমানদের নিকট আল্লাহ তাআলার উপমাহীন কুদরতের কারিশমা। তার নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু খ্রিষ্টানরা একে প্রভুত্বের দলিল মনে করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা মুজিজার সঠিক বাস্তবতা ও রহস্য বুঝতে সক্ষম হলে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ভুলে কখনোই নিপতিত হতো না।

খ্রিষ্টধর্মে শুধু অপূর্ণ কিছু শিষ্টাচারবিষয়ক শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। খ্রিষ্টানরা ধর্মের মূল রুহ ও আত্মা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সঠিক পরিচয় ও তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলির সঠিক জ্ঞান একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে।

জাদু ও মুজিজার মাঝে পার্থক্য

'জাদু' শব্দটি নজরবন্দী, ভেলকিবাজি ও ম্যাজিক ইত্যাদিকে বোঝায়। তবে জাদু অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বিদ্যা যা শেখা-শেখানোর দ্বারা অর্জিত হয়। কিন্তু মুজিজা কোনো বিদ্যা নয় যে, তা শেখা-শেখানো বা কোনো কলাকৌশল রপ্ত করার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। এমনকি মুজিজা নবিদের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা অথবা ইচ্ছাশক্তির সৃষ্ট ফলাফলও নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবিদের থেকে মুজিজা প্রকাশ পাওয়ার সময় তাদের আগাম জ্ঞানও থাকে না। বাহ্যিকভাবে কলম যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিখতে পারে বোঝা যায়, কিন্তু বাস্তবে লেখা যেমন কলমের ইচ্ছাধীন কাজ নয় বরং

---

১৯ (সুরা আনফাল, ১৭)

লেখকের কাজ, তেমনই মুজিজা মূলত আল্লাহ তাআলার কাজ, কিন্তু নবিদের হাতে প্রকাশ পায় মাত্র। কবি বলেন,

শিল্পী ও তার তুলির সামনে চিত্র শক্তিহীন,

মায়ের পেটে শিশু যেমন ক্ষমতা আর উপায়হীন।

কাজেই মুজিজা নবির স্বেচ্ছাধীন কোনো কাজ নয় যে, তিনি যখন ইচ্ছা নিজের আঙুল থেকে ঝরনাধারা প্রবাহিত করতে পারবেন। কিন্তু জাদুবিদ্যা ইত্যাদি এমন নয়। কেননা তা যে সময় ইচ্ছা নির্ধারিত নিয়মনীতি ও নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যাবলির মাধ্যমে প্রকাশ করা ও ঘটানো সম্ভব। আজ অবধি মুজিজার ব্যাপারে না কোনো কিতাব লেখা হয়েছে, না কোনো নিয়মনীতি ও মূলনীতি রচিত হয়েছে, আর না-বা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুজিজা শেখানোর জন্য কায়েম করা হয়েছে। লক্ষ করুন, হজরত মুসা আ. তুর পাহাড়ে আগুন আনার জন্য গিয়ে হঠাৎ করেই নবুয়তপ্রাপ্ত হলেন। এরপরে হঠাৎ করেই তাকে নবুয়তের সত্যায়নস্বরূপ লাঠিকে সাপ ও হাতকে আলোকোজ্জ্বল করে মুজিজাস্বরূপ দান করা হলো। আল্লাহর আদেশে হজরত মুসা আ. লাঠি জমিনে নিক্ষেপ করলে, সাপে রূপান্তরিত হলে তিনি ভয়ে পলায়ন করেন। তার ধারণা ও কল্পনাতেও ছিল না, নবুয়ত দান করে নবুয়তের সত্যায়নস্বরূপ তাকে মুজিজা দান করা হবে। এর দ্বারা বোঝা যায়, লাঠি সাপে রূপান্তরিত ও হাত আলোকময় হওয়া হজরত মুসা আ.-এর ইচ্ছাধীন কাজ ছিল না। বরং তা আল্লাহ তাআলার কাজ ছিল। হজরত মুসা আ. ও ফিরআউনের জাদুকর সামনাসামনি হয়ে, তাদের লাঠি ও দড়িগুলো ছেড়ে দিলে সাপে রূপান্তরিত হয়ে নড়াচড়া করতে দেখে হজরত মুসা আ. ঘাবড়ে যান।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ

মুসা অন্তরে ভয় অনুভব করলেন।[২০]

সুতরাং মুসা আ. নিজেও একজন জাদুকর হলে ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। কেননা মানুষ কখনো স্বীয় ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারা ভয় পায় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, জাদুকররা হজরত মুসা আ.-এর মুখে ভয় ও ঘাবড়ানোর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বুঝতে

---

২০ (সুরা তহা, ৬৭)

পেরেছিল, তিনি তাদের মতো কোনো পেশাদার জাদুকর নন। হজরত মুসা আ.-এর লাঠি যখন সাপ হয়ে তাদের সাপগুলোকে এক লুকমায় গ্রাস করে নিল, তখন তারা বুঝে ফেলল এটা কোনো জাদু নয় বরং আল্লাহ তাআলার কাজ ও কুদরতের কারিশমা, যার সামনে জাদুর কোনো বাস্তবতা নেই। তখন তারা অনিচ্ছায় সিজদাবনত হয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করল,

آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ

আমরা মুসা ও হারুনের রবের প্রতি ইমান আনয়ন করলাম।[২১]

সারকথা

সাধারণ নিয়ম পরিপন্থী যে অলৌকিক বিষয়াবলি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে নবিদের হাতে প্রকাশিত হয়ে তাদের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে তাকে মুজিজা বলে। মানুষ তা দেখে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে এটা নবিদের কাজ নয় বরং আল্লাহ তাআলার কাজ। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবিদের শত্রুদেরকে অক্ষম ও পরাস্ত করার জন্য তাদের হাতে অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ করে নবিদেরকে শক্তিশালী হওয়া সকলের নিকট সুস্পষ্ট করে দেন।

দ্বিতীয় পার্থক্য, জাদু ইত্যাদি জিন-শয়তানদের আয়ত্তাধীন হয়ে থাকে। তাই জাদুর ক্রিয়া তাদের সামর্থ্যের গণ্ডি পার হতে পারে না। পক্ষান্তরে নবিদের মুজিজা জিন-শয়তানদের শক্তিসামর্থ্য থেকে অতি উঁচু স্তরের ও তাদের সাধ্যাতীত বস্তু। আর জাদু আখিরাতেও কোনো উপকারে আসবে না।

জাদুবিষয়ক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

অবশ্যই তারা ভালো করেই জানে, যে ব্যক্তি জাদুবিদ্যা ক্রয় করে আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই।[২২]

---

২১ (সুরা তহা, ৭০)

২২ (সুরা বাকারা, ১০২)

বরং দুনিয়াতেও জাদু শুধু জুলুম, অশ্লীল কার্যকলাপ এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে কাজে লাগে।

জাদু ও মুজিজার মাঝে পার্থক্যসংবলিত ঘটনা

ফিরআউনের জাদুকরদের তালাশ করার জন্য প্রতিনিধি পাঠানো এবং তাদের মধ্য হতে দুজন জাদুকর নিজেদের মৃত জাদুকর পিতার কবরের পাশে এসে হজরত মুসা আ.-এর হাকিকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ও মৃত জাদুকর স্বপ্নে এসে তার সন্তানদের উত্তর দেওয়া, এ নিয়ে আরিফ বিল্লাহ হজরত মাওলানা রুমি রহ. 'মসনবি' গ্রন্থে আজিব একটি ঘটনা লিখেছেন। যার দ্বারা জাদু ও মুজিজার মাঝে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় হয়ে যায়। আমরা উক্ত ঘটনার সারাংশ পাঠকদের সামনে পেশ করছি।

ফিরআউন মুসা আ.-এর মুকাবিলা করার জন্য সমস্ত জাদুকরদের একত্রিত করার হুকুম দেয়। তাদের মধ্য হতে দুজন নওজোয়ান জাদুকর জাদুবিদ্যায় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বাদশাহর পক্ষ থেকে দূত তাদের নিকট পয়গাম নিয়ে যায়, বাদশাহ মসিবতে রয়েছে, তাকে উদ্ধার করার জন্য তোমাদেরকে তদবির করতে ফরমান জারি করেছে। কেননা দুজন ফকির (হজরত মুসা ও হারুন আ.) এসে বাদশাহর অন্দরমহলে হামলা করেছে। অথচ তাদের কাছে একটি লাঠি ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার নেই। তবে লাঠিটি কেমন যেন আজিব ও আশ্চর্য প্রকৃতির, কেননা লাঠিটি তার আদেশে ইয়া বড় অজগর সাপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বাদশাহ ও তার সৈন্যসামন্ত যারপরনাই শক্তিসামর্থ্য ও কলাকৌশল ব্যয় করে তাদের সাথে পেরে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। দূত তাদেরকে আরও জানায় বাদশাহ বলেছে, তোমরা যদি উক্ত বিপদ দূর করতে পারো, তাহলে সে তোমাদেরকে এর প্রতিদানে অগাধ পুরস্কারে সম্মানিত করবেন।

অতঃপর উক্ত জাদুকর দুজন বাদশাহর পয়গাম শ্রবণ করে বাড়িতে এসে মায়ের কাছে তাদের বাবার কবর কোথায় জিজ্ঞাসা করে বলে, আমরা আমাদের পিতার আত্মার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করব। মা তাদের পিতার কবরের পাশে নিয়ে যায়। তারা সেখানে গিয়ে ফিরআউনের নামে তিনটি রোজা

রাখে। এরপরে তাদের পিতার রুহকে ডেকে বলে, বাবা! সম্রাট আমাদের নিকট দূত পাঠিয়ে জানিয়েছে, দুজন দরবেশ আমাদের ও আমাদের রাজ্যকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে এবং সমস্ত সৈন্য ও প্রজাদের সামনে আমাদেরকে অপমান আর লাঞ্ছনায় উলঙ্গ করে ছাড়ছে। তারা দুজন বড়ই আজিব ধরনের দরবেশ, তাদের কাছে একটি লাঠি ছাড়া সৈন্যসামন্ত ও হাতিয়ারের কিচ্ছুটি নেই। তবে হ্যাঁ, সব অকল্যাণ আর জাদুমন্ত্র ওই লাঠির পেটেই রয়েছে।

হে পিতাজি! আপনি সত্যের জগতে রয়েছেন, যদিও তা বাহ্যিকভাবে মাটি মনে হয়। আমাদেরকে উক্ত দরবেশদ্বয়ের হাকিকত অবহিত করুন। তার এ লাঠি যদি কোনো জাদুবিদ্যার ফল হয় তাও বলে দিন আর যদি আল্লাহ তাআলার কোনো কুদরতি কারিশমা হয় সেটাও বাতলে দিন। যাতে করে আমরাও তাদের খোদার অনুসারী হয়ে না-কাম থেকে সফলকাম হতে পারি। কেননা এখন আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃসময় পার করছি। হতে পারে কোনো আশার ফোয়ারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। কারণ আমরা এখন গুমরাহিতে আচ্ছন্ন অমাবস্যার কালো রাত্রিতে রয়েছি, হতে পারে হিদায়াতের কোনো সূর্য উদিত হয়ে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আগমন করেছে। আর আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে হিদায়াতের পথে টানছেন। মোটকথা আপনি আমাদেরকে তাদের বাস্তবতা অবগত করুন।

মৃত জাদুকরের সন্তানদের প্রত্যুত্তর

মৃত জাদুকর উত্তরে বলে, হে আমার সন্তানেরা! আমি উক্ত দুজন ও তাদের কাজের বাস্তবতা খুব ভালো করেই জানি। কিন্তু আমার সুস্পষ্ট করে বাতলে দেওয়ার অনুমতি নেই। তবে আমি তোমাদেরকে কিছু নিদর্শন বয়ান করছি, যার দ্বারা এর নিগূঢ় রহস্যজাল তোমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তা হলো এই, তোমরা দুজন সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখবে তারা কোথায় ঘুমায়। যখন তোমরা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাবে, তার কাছ থেকে লাঠিটি চুরি করার জন্য চেষ্টা করবে আর খুব করে মনে রাখবে, ভয় পাওয়া যাবে না, অন্যথায় কিন্তু রহস্য উদ্ঘাটিত হবে না। সুতরাং তোমরা লাঠিটি চুরি করতে সফল হলে নির্দ্বিধায় বুঝে নেবে, মুসা আ. ও তার সঙ্গী উভয়ই জাদুকর। আর জাদু ও ম্যাজিক ভন্ডুল ও লন্ডভন্ড করা তোমাদের জন্য কোনো কঠিনতর কাজ নয়। কেননা তোমরা জাদুবিদ্যার কামিল পণ্ডিত ও মাহির খেলওয়াড়।

আর তোমরা যদি উক্ত লাঠি চুরি করতে সক্ষম না হও, তাহলে মনেপ্রাণে বুঝে নেবে, তা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও অদৃশ্যের কোনো কারিশমা। সুতরাং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেবে, তারা দুজন কোনো জাদুকর নন বরং আল্লাহ প্রেরিত হিদায়াতপ্রাপ্ত বান্দা। কেউ তাদের পরাস্ত করতে পারবে না। ফিরআউন যদি পূর্ব-পশ্চিমের রাজত্বও করায়ত্ত করে নেয়, তবুও আল্লাহ তাআলার সাথে লড়তে সক্ষম হবে না।

তোমরা খুব ভালো করেই জেনে থাকবে, জাদুকর যখন ঘুমিয়ে পড়ে জাদুর ক্রিয়া তখন খতম হয়ে যায়। তাই তাদের উক্ত জাদুর লাঠির ক্রিয়াও ঘুমন্ত অবস্থায় নিষ্ক্রিয় ও অকেজো হয়ে পড়বে। রাখাল যেমন মেষপাল থেকে উদাসীন হলে বাঘ মেষপালের ওপর হামলে পড়ে। কারণ ঘুমানোর কারণে রাখালের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পর্যবেক্ষণ করা অকেজো ও নিথর হয়ে পড়ে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হবে যদি কোনো বস্তু হিফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজ জিম্মায় নিয়ে থাকেন। সেখানে বাঘের উপস্থিতিও বেকার। কেননা আল্লাহ তাআলার ওপর উদাসীন কখনো চাদর মিলতে পারে না। সুতরাং তোমরা যদি তার লাঠি চুরি করতে না পারো, তাহলে বুঝে নেবে তা আল্লাহ তাআলার কারিশমা, যা কেউ কখনো ভাঙতে পারবে না। আর দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করে নেবে, তারা দুজন সত্য নবি এবং লাঠিটি নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এমন অকাট্য প্রমাণ যে, ঘুমানো তো সাধারণ বিষয়, যদি তাদের মৃত্যুও হয়ে যায় তবুও আল্লাহ তাআলা তাদেরই বিজয় দান করে সম্মানিত করবেন আর তারা কখনোই পরাজিত হওয়ার নন এবং পরাজিত হবেনও না। ছেলেরা আমার! যাও, এটাই সত্য নিদর্শন যা আমি তোমাদেরকে বাতলে দিয়েছি এবং এটাকে তোমরা অন্তরে গেঁথে রেখো। আল্লাহু আলামু বিস সাওয়াব।

ছেলে দুজন পিতার আদেশ শুনে হজরত মুসা আ.-এর তালাশে বের হয়ে জানতে পারল, তারা দুজন একটি গাছের নিচে ঘুমিয়ে আছেন। লাঠিটি তাদের সাথেই পাশে রয়েছে। তারা এ সময়কে মোক্ষম সুযোগ মনে করে লাঠি চুরি করার জন্য উদ্যত হলে হঠাৎ লাঠিটি কম্পন করা শুরু করল এবং বিশাল এক অজগরের রূপ নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করতে এলে তারা তা দেখে জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচে।[২৩]

মাওলানা বাহরুল উলুম রহ. *মসনবির* ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, আল্লামা রুমি রহ. উক্ত ঘটনার মাধ্যমে জাদু ও মুজিজার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে সুস্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ

---

২৩ কাজি সাজ্জাদ হুসাইন অনূদিত উর্দু *মসনবি*, ২/১২৪-১২৭। এই বর্ণনার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই।

জাদু জাদুকরের উদাসীনতায় ক্রিয়াশীল থাকে না। কেননা জাদু জাদুকরের কাজ হওয়ার কারণে জাদুকরের শক্তিসামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে সচল থাকে। কাজেই জাদুকর যখন স্বীয় জাদু থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন তার জাদুও অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু মুজিজা এমন নয়। কেননা মুজিজা আল্লাহ তাআলার কাজ, যা আল্লাহ তিনি নিজ কুদরত দ্বারা কোনো মাধ্যম ছাড়া নবিদের হাতে সৃষ্টি করে তাদের নবুয়ত প্রমাণিত করেন। আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বস্তু যতক্ষণ না তিনি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস না হয়ে অবশিষ্ট থাকে। রাসুলদের উদাসীনতার কারণে মুজিজা বাকি থাকা ও না থাকার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মুজিজা প্রকাশ ও সংঘটিত হওয়ার সাথেও নবিদের কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছার হাত নেই। অর্থাৎ নবি ও রাসুল যখন অলৌকিক কোনো ঘটনাবলি প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করবেন, তখন মুজিজা প্রকাশিত হবে অন্যথায় হবে না বিষয়টি এমন নয়। কেননা মুজিজা এমন অতিপ্রাকৃত অলৌকিক বিষয়কে বলে, যা প্রকাশ করতে মানবীয় শক্তি অক্ষম। কারণ মুজিজা আল্লাহ তাআলার কাজ। তবে মুজিজা প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি আম্বিয়া আ. কখনো আগে থেকেই জানতে পারেন আবার নাও পারেন। লাঠি মুসা আ.-এর স্বেচ্ছায় বা তার শক্তি ব্যয় করার দ্বারা সাপে পরিণত হলে, তিনি কখনোই তা দেখে ভয় পেতেন না। তবে মুজিজা কখনো-সখনো নবিদের দুআ ও ইশারার মাধ্যমেও প্রকাশিত হয় যেমন, আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিজা তাঁর আঙুলের ইশারা করার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চন্দ্র দুভাগ করার কোনো পদ্ধতি জানা ছিল না। তাঁকে এ ক্ষমতাও দেওয়া হয়নি, যখন ইচ্ছা তখন তিনি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করতে পারবেন। কুরআন মাজিদও আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বিশেষ মুজিজা। কিন্তু কুরআন মুজিজা তথা অক্ষমকারী হওয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাধীন কাজ নয় যে, এতে তাঁর শক্তিসামর্থ্যের দখলদারি থাকবে।

সারকথা

জাদুর ক্রিয়া উদাসীন অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে না। কারণ জাদু জাদুকরের ইচ্ছাশক্তি ও সাধ্যের ওপর নির্ভরশীল। যে বস্তু সৃষ্টিজীবের ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তা ক্রিয়াশীল থাকার জন্য ইচ্ছাকারী ব্যক্তির উক্ত বস্তুর থেকে উদাসীন না হওয়া শর্ত। অন্যথায় তা ধ্বংস ও বেকার হয়ে পড়বে। আর মুজিজা বহাল থাকার

জন্য মুজিজা প্রকাশকারী তথা নবিদের উদাসীন হওয়া না-হওয়া শর্ত নয়। কেননা মুজিজা আল্লাহ তাআলার কাজ, যা নবিদের ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রকাশিত হয় না। সুতরাং মুজিজা এমন আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা, যা আল্লাহ তাআলা নবিদেরকে কোনো মাধ্যম, উপায়-উপকরণ, ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করা ব্যতিরেকে তাদের হাতে প্রকাশ করে থাকেন। চাই তা নবিদের দুআ করার পরে ঘটুক, বা দুআ ব্যতীত প্রকাশিত হোক। সর্বাবস্থায় মুজিজা আল্লাহ তাআলার কাজ হিসেবেই গণ্য হবে। অর্থাৎ নবিদের জানা থাকে না নীলনদে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে কীভাবে রাস্তা হবে। আল্লাহ তাআলার আদেশে হজরত মুসা আ. যখন লাঠি দিয়ে নীল দরিয়াতে আঘাত হানলেন, তখন কুদরতের কারিশমায় পানির মাঝে দিয়ে রাস্তা হয়ে গেল। তিনি বনি ইসরাইলকে নিয়ে নীলনদ পার হয়ে গেলেন। অথচ মুসা আ. আগে থেকে জানতেন না, পানির ওপর লাঠি দিয়ে আঘাত করার দ্বারা বারোটি রাস্তা হয়ে যাবে। কুরআনের অসংখ্য আয়াত সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত, মুজিজা নবিদের শক্তিসামর্থ্যের ঊর্ধ্বের ও উঁচুমানের বস্তু। বরং আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরত দ্বারা মুজিজা সৃষ্টি করে রাসুলদের রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করেন।

ইরহাসাত

সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী অলৌকিক যে ঘটনা নবিদের থেকে নবুয়তের পূর্বে প্রকাশিত হয় তাকে ইরহাসাত বলে। 'ইরহাসাহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ, বুনিয়াদি পাথর। অর্থাৎ এই ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলি যেন নবুয়তের আগাম ভূমিকা ও প্রারম্ভিকা। আর সূক্ষ্ম উপকরণ দ্বারা বিশেষ কোনো নিয়মনীতি ও মূলনীতির অধীনে নির্ধারিত সময়ে প্রকাশিত হওয়া অনভিপ্রেত বস্তুকে জাদু বলে।

কারামত ও ইসতিদরাজের সংজ্ঞা

সত্য নবিদের অনুসরণ করার দ্বারা অলিদের হাতে যে অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, তাকে কারামত বলে। আর শয়তানি কার্যকলাপ তথা কুফর, শিরক, পাপাচার, বেলেল্লাপনা, প্রবৃত্তি এবং খাহেশাতের অতল গহ্বরে অবগাহন করার দ্বারা অর্জিত ক্ষমতাকে ইসতিদরাজ বলে। যেমন দাজ্জাল ও গণকদের অলৌকিক বিষয়াবলি ইত্যাদি।

কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য

কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য এমন, যেমন হালাল সন্তান ও জিনার সন্তানের মাঝে পার্থক্য। জ্ঞানীরা দেখা মাত্র চিনতে পারে কোন আয়নাকে গোলাপজল দিয়ে ধোয়া হয়েছে, আর কোন আয়নাকে পেশাব দিয়ে ধৌত করা হয়েছে।

কবি বলেন,

হক্কানি ব্যক্তিদের কপালের নুরের বিচ্ছুরণ
বিবেকবানদের নিকট গোপন থাকে কতক্ষণ।

সান্নিধ্যের বরকত ও অভ্যন্তরীণ ঝোঁক-প্রবণতা

ক্রিয়াশীল অন্তর শরীরের সাথে সম্পৃক্ত বা দেহে প্রোথিত বস্তু নয়। বরং স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ব-প্রতিষ্ঠিত বস্তু। শরীর থেকে একদম আলাদা। শরীরের সাথে

অন্তরের সম্পর্ক হলো পরিচালনার ও ব্যবস্থাপনার। অর্থাৎ রুহ শরীরকে পরিচালিত করে। সুতরাং ক্রিয়াশীল অন্তর যেমন স্বীয় শরীরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনই অন্য শরীরে পবিত্রতা ও নুরানিয়াতের কারিশমায় প্রভাব বিস্তার করা কি কোনো আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে? কেননা যে অন্তর আপন শরীরে প্রভাব বিস্তার করে, সেটিও শরীর থেকে একেবারেই আলাদা ও পৃথক। তাহলে অন্য আরেকটি আলাদা শরীরে প্রভাব বিস্তার না করার হেতু কী হতে পারে? তবে হ্যাঁ, সাধারণ কোনো অন্তর এ প্রভাব ও কার্যক্ষমতা অন্য শরীরে প্রতিফলিত করার যোগ্যতা রাখে না। প্রত্যেক লোহাতে যেমন চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণের যোগ্যতা থাকে না এবং সকলেই এ চৌম্বকীয় আকর্ষণের অবস্থা ব্যক্ত করতে পারে না। প্রত্যেকেই তেমন অন্য অন্তরে প্রভাব ফেলার অবস্থা ও বাস্তবতা বর্ণনা করার যোগ্যতা রাখে না। তবে যে অন্তর নুরের আলোয় নুরানি এবং পবিত্রতা ও শুভ্রতার আভায় ফেরেশতাদের মতন তা অন্যের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

কারামত ও মুজিজার মাঝে পার্থক্য

নবিদের অলৌকিক ক্ষমতা শ্রেণী ও স্তরভেদে অলিদের অলৌকিক বিষয়াবলি থেকে শ্রেষ্ঠতর ও অতি উঁচুমানের হয়ে থাকে। যেমন, ঊর্ধ্বলোক গমন, মৃতদের জীবিত করা ইত্যাদি। আর আউলিয়া কিরামের অলৌকিক বিষয়াবলি নবিদের অলৌকিক ঘটনাবলি থেকে নিম্নতর ও নিম্নমানের হয়ে থাকে। যেমন অল্প জিনিস অধিক হয়ে যাওয়া, স্বপ্ন ও ইলহামের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোনো বিষয় জ্ঞাত হওয়া ইত্যাদি। এমনইভাবে অলিদের কার্যক্রম নবিদের কার্যক্রম থেকে নিম্নমানের হয়। কেননা নবিদের ছোট-বড় সব ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা দান করা হয়। যেমন কুরআনে এসেছে,

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

অবশ্যই তিনি তাঁর রবের বড় নিদর্শন দেখেছেন।[২৪]

---

২৪ (সুরা নাজম, ১৮)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আম্বিয়া কিরাম আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদত্ত আয়াত তথা নিদর্শন ও মুজিজা দুপ্রকারে বিভক্ত।

এক. আয়াতে কুবরা, অর্থাৎ বড় বড় নিদর্শন ও মুজিজা, যেমন চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, গগনপথে গমন করা, গাছ ও পাথরের সালাম দেওয়া ইত্যাদি।

দুই. আয়াতে সুগরা, অর্থাৎ ছোট ছোট আলামত ও মুজিজা। যেমন খাবার ইত্যাদিতে বরকত হওয়া ইত্যাদি। আউলিয়া কিরামের কারামত কখনোই মুজিজার প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তবে মুজিজার দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু অলিদের কারামত দ্বিতীয় প্রকারস্থ হওয়া সত্ত্বেও আয়াতে সুগরা তথা নবিদের ছোট ছোট মুজিজা থেকেও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে হাজার গুণে নিম্নমানের হয়। নবিদের দুআয় হাসিলকৃত বরকত কল্পনাতীত হয়ে থাকে। আর অলিদের হাত থেকে যে কল্যাণ ও বরকত প্রকাশিত হয়, তা নবিদের বরকত থেকে শ্রেণি ও স্তরভেদে অনেক স্বল্প ও নিম্নস্তরের হয়। নবিদের অভ্যাস, পদমর্যাদা ও সম্মান যেমন অলিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক উঁচুমানের। তেমনই নবিদের মুজিজাও আউলিয়া কিরামের কারামত থেকে শ্রেষ্ঠ ও অতি উঁচুমানের।

নবি ও গণকের মাঝে পার্থক্য

নবিদের নিকট ওহি নিয়ে আসেন ফেরেশতা। আর গণকদের ওপর সওয়ার হয় জিন ও শয়তান। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ

আমি তোমাদের বলে দেবো, শয়তান কাদের ওপর সওয়ার হয়?[২৫]

নবিদের জ্ঞানে কখনো ভুলত্রুটি হয় না। আম্বিয়া কিরামের প্রদত্ত অদৃশ্যের সংবাদ অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়। কিন্তু গণকদের লব্ধ জ্ঞানে গরমিল দেখা দেয়। গণকদের ভবিষ্যদবাণী অধিক সময় ভুল হয়, আবার কখনো সঠিকও হতে পারে। হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইবনু সাইয়াদ (সে একজন গণক ছিল ও নবি হওয়ার দাবি করত)-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নিকট কি কোনো অদৃশ্যের খবর এসে থাকে? প্রত্যুত্তরে সে বলে, হাঁ, আমার কাছে সত্য-মিথ্যা সব রকমেরই সংবাদ আসে। কোনোটি সত্যও হয়, আবার কোনোটি মিথ্যাও হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ

তোমার সামনে বাস্তবতাকে গোলমেলে করে দেওয়া হয়েছে।[২৬]

অর্থাৎ নবুয়তে সত্য-মিথ্যায় সংমিশ্রণ হয়ে বাস্তবতা খলত-মলত হয় না। বরং নবুয়তের বৈশিষ্ট্যই হলো, সত্যবাদিতা এবং এতে মিথ্যা, ধোঁকা ও বাস্তবতাপরিপন্থী কোনো সংবাদ সংঘটিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব। এতে কোনো দ্বিমত নেই, যে সংবাদ সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে জগাখিচুড়ি হয়, তাতে না কেউ ভরসা করে, আর না তা গ্রহণযোগ্য ও দিল-প্রফুল্ল সংবাদ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কাজেই যে সংবাদ সত্য-মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত, তা না ধর্তব্য হতে পারে, আর না এতে নেক ফালি ও শুভ লক্ষণের আশা করা যেতে পারে। বরং গণকের নিজেরই স্বীয়

---

২৫ (সুরা শুআরা, ২২১)

২৬ *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৩২৯। বুখারি, *আদাবুল মুফরাদ*, ৯৫৮। সহিহ।

সংবাদের ব্যাপারে সত্য হওয়ার দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতা থাকে না। এ কারণে গণক নিজেই স্বীয় প্রদত্ত সংবাদে দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। তাই তারা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে কোনো কথা বলতে চায় না। কারণ পষ্ট পরিষ্কার করে এক কথা বললে বাস্তবে এর ব্যতিক্রম দেখা দিলে তাদের জাত-সম্মান, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির যবনিকা ঘটবে। এ ভয়ে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য-মিথ্যা উভয়টির সম্ভাবনা রাখে এমন ধারণাভিত্তিক কথা বলে দুদিকেই ফলাফল নামাতে চায়। কোনো কোনো সময় গণকরা প্রতারণার ছলে আগেভাগেই কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করে রাখে। মানুষকে ধোঁকার ফাঁদে আটকানোর জন্য অদৃশ্যের কথাবার্তাও বলে বেড়ায়। নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য চমকপ্রদ ও জাদুময়ী অন্ত্যমিলপূর্ণ কথাবার্তার ঝলকে মানুষকে বুঁদ করে রাখে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

هَذَا مِنْ سَجْعِ الْكُهَّانِ

এ কথাটি গণকদের অন্ত্যমিলপূর্ণ কথার মতো।[২৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কার গণকেরা তাদের দুরভিসন্ধি, উদ্দেশ্য ও লোভ-লালসার জিহ্বা সামলাতে না পেরে ইমান আনেনি। এদের মধ্যে রয়েছে যেমন, মুসাইলামাতুল কাজজাব ও ইবনু সাইয়াদ এবং এরা নবুয়তেরও দাবি করেছিল।

কিন্তু যাদের অন্তর ছিল এসব থেকে পবিত্র, তারা তাদের জান-প্রাণ দিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ইমান এনেছিলেন। যেমন, হজরত তুলাইহা আসাদি ও সাওয়াদ ইবনু কারিব রা. প্রমুখগণ। যাদের ঘটনা ইতিহাসের পাতায় এখনো সুপ্রসিদ্ধ ও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। ইসলাম গ্রহণ করার পরে তারা যে-সমস্ত কার্যাবলির আঞ্জাম দিয়েছিলেন, তা আজও তাদের সত্য ইসলাম গ্রহণের সৌকর্যের বিরল সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

---

২৭. *তারিখু ইবনি খালদুন*, ১/১২৬। এই শব্দে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাদিসের সনদ পাওয়া না গেলেও সহিহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। *সহিহ বুখারি*, ৫৭৫৮, ৫৭৫৯। *সহিহ মুসলিম*, ১৬৮১।

নবি এবং ভণ্ড নবির মাঝে ব্যবধান

নবি ও মুতানাব্বির (মিথ্যা নবুয়তের দাবিকারী) মাঝে পার্থক্য, ভণ্ড নবি ও নবুয়তের মিথ্যাদাবিদার নবির সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে। কেননা নবুয়তের দাবিকারী এ দাবির মাধ্যমে দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য ও খাহেশাতের অভিলাষে মরিয়া হয়ে ভোগবিলাসে মদমত্ত হতে চায়। আর হজরত আম্বিয়া কিরাম আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল উদ্দেশ্য ও আসল মাকসাদ দুনিয়ার স্বাদ ও ভোগবিলাস থেকে নিজেরা বিরত থাকা এবং অন্যকে এর থেকে বিরত রাখা।

মুতানাব্বি বাহ্যিক কাজকর্মে নবির নকল হয়ে থাকে। বুদ্ধিমানেরা তো প্রথম দর্শনেই আসল-নকলের তফাত বুঝতে পারে। আর সাধারণ মানুষদের নিকট অল্পকয়েক দিনের মাঝেই ভণ্ড নবির বাস্তবতা ও আসল রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভণ্ড নবির দিবানিশি কাটে ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তির পেছনে চক্কর দিয়ে দিয়ে এবং সে সর্বদা তা অর্জন করার চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে। ধোঁকা দেওয়ার জন্য আম্বিয়া কিরামের ওপর অবতীর্ণ ওহি নকল করে উক্ত শব্দাবলির মাঝে হেরফের ও নিজের পক্ষ থেকে কিছু শব্দ জুড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে শুনিয়ে বলে, আমার ওপর মাত্র এ ওহি নাজিল হলো! অথচ নবিদের ওপর ওহি নাজিল হওয়ার সময় এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হতো এবং হঠাৎ এক আচ্ছন্নভাব তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিত। যার দ্বারা প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শী তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলত, এ ভাবাবস্থা নিজের সৃষ্ট নয় এবং এতে নবিদের ইচ্ছা ও সংকল্পের কোনো হাতও নেই।

আর মুতানাব্বির ওহি অবতীর্ণ হওয়ার সময় না কোনো বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়, আর না-বা হঠাৎ কোনো আচ্ছন্নভাব তাকে ঢেকে নেয়। নবি দাবিদার যে কথাকে ওহি বলে প্রচার করে, তার অধিকাংশেই নবি ও হাকিম এবং আরব কবি-সাহিত্যিকদের কথা চুরি করে তাতে একোণ-ওকোণ পরিবর্তন করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়। বাহ্যিক বেশভূষায় দুনিয়াত্যাগী বলে প্রকাশ করেও প্রাণপণে দুনিয়ার ধনসম্পদ ও যশ-খ্যাতির নেশায় ডুবে থাকে। যারপরনাই চেষ্টা করে তার এ দুরভিসন্ধি গোপন করার জন্য গায়ে দুনিয়াবিমুখতার চাদর পরিধান করলেও কোনো না কোনোভাবে আসল চেহারা ও মূল উদ্দেশ্য মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে যায়। তার আসল পর্দা ফাঁস হয়ে বাস্তবিক রূপ প্রকাশিত হয়ে যায়। অল্প দিনের মধ্যে সে জনসমাজে লাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়। কখনো তার কাছে সূক্ষ্ম কোনো

মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে বিভিন্ন রকমের হম্বিতম্বি শুরু করে দেয় এবং তার মাঝে এক ধরনের সংকোচবোধ পরিলক্ষিত হয়, এরপরেও যখন উত্তর দেয়, যেহেতু তার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত কালামের সঠিক জ্ঞান নেই, তাই উত্তর দিতে অধিক সময় উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। আর উত্তরগুলো স্ববিরোধী, মতানৈক্যপূর্ণ ও বিভেদসৃষ্টিকারী হয়ে থাকে। বিবেকবানেরা এই স্ববিরোধী ও মতানৈক্যপূর্ণ বক্তব্যের দ্বারা বুঝে নেয়, এ কথা আল্লাহ তাআলার বাণী হতে পারে না। কখনো-সখনো নবি দাবিদার স্বেচ্ছায় বিরোধপূর্ণ বক্তব্য দেয়। যাতে সুযোগমতো তার পক্ষে কাম দেয়। নবুয়তের দাবি করার প্রারম্ভে সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে দূরদর্শিতার চক্ষু দিয়ে চারপাশে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে, এরপর ফসল কাটার জন্য কাস্তে হাতে মাঠে নামে। যাদের বিবেকবুদ্ধি অপূর্ণ এবং যারা দ্বীন সম্বন্ধে একেবারেই কাঁচা ও অজ্ঞ, তাদেরকে দলে খুব সহজেই ভিড়িয়ে নিয়ে তার জালে আটকে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা গায়েগতরে নীরবতা অবলম্বন করে এবং অধিক উপাসনা করে দুনিয়ার মুসাফির আখিরাতের মেহমান সেজে ঘুরে বেড়ায়, নিজের কাজে অল্প সম্পদ ব্যয় করে অন্যের সামনে দানশীলতার মেঘ হয়ে বর্ষণ করে। বিভিন্ন অবস্থা ও উপায়-উপকরণ দেখে ভবিষ্যদবাণী করতে থাকে। যদি ভবিষ্যদবাণী নাও করে, তবুও বিভিন্ন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের কসরত চালায় ইত্যাদি।

অলৌকিক বিষয়াবলি প্রকাশিত হওয়ার হিকমত

অতিপ্রাকৃত অলৌকিক বিষয়াবলি প্রকাশিত হওয়ার সব থেকে বড় হিকমত, আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীকে আলমে আসবাব তথা উপায়-উপকরণের জগৎ বানিয়ে প্রত্যেক কাজকে একটি কারণ ও উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত করে দিয়েছেন এটা জানা যায়। এ কারণেই বস্তুবাদীদের দৃষ্টি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ওপরই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এমনকি বস্তুবাদীরা উপায়-উপকরণের কারণে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেছে। তারা বলে, একমাত্র যুগই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে এবং পরিশেষে এই যুগই আমাদেরকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করবে। পৃথিবীর সমস্ত কাজ সময়ের হাতেই আবিষ্ট এবং পৃথিবীতে যা-কিছু

হয় সবকিছুই বস্তুর নড়াচড়ার চিরন্তন ফলাফল। এ কারণে আল্লাহ তাআলা জায়গায় জায়গায় অলৌকিক ঘটনাবলির অবতারণা করে যুগবাদী নাস্তিক ও বস্তুবাদীদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, এ কুলকায়েনাতের লাগাম তাদের ধারণার বিপরীতে অন্য এক সত্তার করায়ত্তে রয়েছে। ওই সত্তা যখন ইচ্ছা করেন সমস্ত বস্তুকে নিষ্ক্রিয় ও অকেজো করে দিতে পারেন। অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হওয়ার কারণে মানুষ বুঝতে পারে, কোনো উপায়-উপকরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমতার অধিকারী নয়। বরং সবকিছুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সচল রাখেন, যাকে ইচ্ছা করেন অচল ও অকেজো করে দেন।

অলৌকিক বিষয়াবলি প্রকাশিত হওয়ার দ্বিতীয় হিকমত, মানুষ যাতে জানতে পারে, হজরত আম্বিয়া কিরাম আ.-এর সাথে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সম্পর্ক থাকার কারণে তাদের প্রতি ভিন্নতর সবার থেকে আলাদা বিশেষ রহমত রয়েছে। এদিকে লক্ষ করে সাধারণ লোকেরা যেন তাঁদের আনুগত্য করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে সচেষ্ট হয়।

সিংহাসন, রাজমুকুট এবং শাহি সিলমোহরের সাথে যেমন রাজত্ব ও রাজাবাদশাদের সম্পর্ক ও বিশেষত্ব রয়েছে, তেমনই মুজিজা দ্বারা হজরত আম্বিয়া কিরাম আ. আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্যপূর্ণ বান্দা ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হওয়া প্রমাণিত হয়।

শাইখ আবু আলি সিনা রহ. বলেন, সমস্ত নবি আনুগত্যের উপযুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কারণ তাদেরকে যে নিদর্শন ও মুজিজা দান করা হয়েছে, তা তৎক্ষণাৎ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে এ মুজিজা ও নিদর্শনগুলো সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত।[২৮]

---

২৮. দ্রষ্টব্য, ইবনু আশুর, *আত-তাহরির ওয়াত-তানবির*, ১/১৮২।

মুজিজা অস্বীকারকারীদের বিভিন্ন সংশয় ও আমাদের উত্তর

যে-সমস্ত লোকের দৃষ্টি শুধু বাহ্যিক জড়পদার্থ, অণু-পরমাণু, অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু ও দর্শনবাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তারা মুজিজা ও অলৌকিক বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে বড় মুখ করে বলবে, মুজিজা বিবেকবুদ্ধিপরিপন্থী ও অসম্ভব একটি বিষয় এটাই স্বাভাবিক। কেননা তাদের দৃষ্টিতে কোনো বস্তু কারণ ও উপায়-উপকরণ ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করা অসম্ভব, বরং কস্মিনকালেও সম্ভবপর হতে পারে না। কেননা এ পৃথিবী উপায়-উপকরণ দ্বারা সৃষ্ট, কাজেই কোনো বস্তু কারণ ছাড়া আদৌ ঘটতে পারে না।

দুই. কখনো তারা বলে, মুজিজা এবং কারামত স্বভাবগত নিয়মনীতি ও সামর্থ্যযোগ্য নীতিমালার পরিপন্থী।

তিন. কখনো বলে, মুজিজা ও অলৌকিক বিষয় মান্য করা ধারণাপূজার নামান্তর। সুতরাং মুজিজা ও অলৌকিক ক্ষমতাকে মান্যকারীরা নির্বোধ, অবচেতন এবং ধারণাপূজারি।

চার. কখনো বলে, অলৌকিক বিষয়াবলিকে মান্য করলে গোটা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খল ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়া আবশ্যক হয়ে যাবে। কারণ অলৌকিকতাকে মানলে মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ থেকে মানুষের নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস উঠে যাবে।

পাঁচ. কখনো বলে থাকে, অলৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস রাখা উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে বাধা ইত্যাদি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

মুজিজা অস্বীকারকারীদের সর্ববৃহৎ সংশয়, কোনো বস্তু মাধ্যম বা উপায়-উপকরণ ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু এটি তাদের নিছক দাবি মাত্র। এ দাবির স্বপক্ষে আজ অবধি তারা কোনো প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেনি। অসম্ভব এমন বিষয়কে বলে, যা অস্তিত্বহীন ও অবিদ্যমান হওয়ার ক্ষেত্রে অকাট্য কোনো যুক্তিনির্ভর দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। অথচ কোনো বস্তু সাবাব (سبب) তথা কারণ (cause) ও উপায়-

উপকরণ ব্যতীত সৃষ্টি হতে পারে না, এ বিষয়ের ওপর আজ পর্যন্ত তারা কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ দাঁড় করাতে সক্ষম হয়নি। যে-সমস্ত লোক বলে, কোনো বস্তু উপায়-উপকরণ ব্যতীত সৃষ্টি হওয়া ও অস্তিত্ব লাভ করা অসম্ভব, তাদের কাছে আমাদের সবিনয় প্রশ্ন, যদি কোনো ফলাফল বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপকরণের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে বলুন! উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম কি স্বীয় সত্তাগত উপায়-উপকরণ দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, নাকি কোনো মাধ্যম বা কারণ ছাড়াই উপায়-উপকরণ বনে গেছে? যদি উপকরণ সৃষ্টির জন্য অন্য উপায়-উপকরণ প্রয়োজন হয়, তাহলে ধারাবাহিকতা আবশ্যক হয়ে আপনা-আপনিই এক নিঃশেষ ধারাবাহিকতা মান্য করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা সমস্ত বিবেকবান ব্যক্তির নিকট অবান্তর একটি বিষয়। কোনো সন্দেহ নেই, উপায়-উপকরণ এমন একটি মাধ্যম বা কারণ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে শেষ হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়, যা কোনো কারণ ও উপায়-উপকরণ থেকে সৃষ্ট হওয়া ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে। যে প্রথম উপকরণের ওপর সমস্ত উপায়-উপকরণের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায়, তাকে সাবাবে উলা তথা প্রথম উপকরণ বা কারণ বলে, যেটি উপায়-উপকরণের ধারাবাহিকতার চূড়ান্ত সীমা এবং সেটি কোনো উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে বলে প্রমাণিত হয়।

সুতরাং যে সত্তা প্রথম বস্তুকে কোনো উপকরণ ছাড়া সৃষ্টি করতে ও অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম, তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয় অন্য বস্তুকেও কোনো উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে সৃষ্টি ও অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম। কারণ শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষের বিবেচনায় একইরকম।

উদাহরণস্বরূপ, রুটি আটা থেকে হয়, আটা গম থেকে আর গম ক্ষেত থেকে। এ ধারাবাহিকতা ক্ষেত পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায়। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় ক্ষেত কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তখন ক্ষেত গম থেকে সৃষ্টি হয়েছে এ উত্তর দেওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো উত্তর আর থাকে না। কিন্তু যখন গম ক্ষেত থেকে সৃষ্টি হওয়া ও গম থেকে ক্ষেত সৃষ্টি হওয়া বলা হবে, তখন একই বস্তুর বারংবার পালাবর্তন আবশ্যক হয়ে যায়, অথচ তা সমস্ত বিবেকবানের নিকট অবান্তর একটি বিষয়। সুতরাং আবশ্যকীয়ভাবে স্বীকার করতে হয়, প্রথম গমক্ষেত কোনো মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম 'গম' ক্ষেত ব্যতীত উৎপাদিত হয়েছে অথবা প্রথম 'ক্ষেত' গম ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং যখন উপায়-উপকরণের ধারাবাহিকতার সদস্যগুলোর মধ্য হতে একটিকে সাবাব তথা উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে সৃষ্টি ও অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হওয়া প্রমাণিত হলো, তখন উপায়-উপকরণের প্রত্যেক

সদস্যের মাঝেও প্রমাণিত হওয়া সাব্যস্ত হবে। কারণ আল্লাহ তাআলার শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্য বস্তুর সমস্ত সদস্যের ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন। কর্মবিধায়ক আল্লাহ তাআলা বস্তুসমূহের একটি সদস্যকে কোনো উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে সৃষ্টি ও অস্তিত্ব দান করে দেখিয়েছেন, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি তিনি কাদিরে মতলাক, অর্থাৎ যে বস্তুকে চান কোনো মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে সৃষ্টি ও অস্তিত্ব দান করার ক্ষমতা রাখেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

মানুষ নুতফা তথা শুক্রাণু থেকে সৃষ্ট আর শুক্রাণু মানুষ থেকে। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রথম মানুষ অথবা প্রথম শুক্রাণুকে কোনো উপকরণ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ

আর তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে।[২৯]

অর্থাৎ প্রথম মানুষ শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং মাটি থেকে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপরে মানুষের বংশপরম্পরা বাকি রাখার জন্য শুক্রাণুর দ্বারা আঞ্জাম দিয়ে উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমের ধারাবাহিকতা চালু করে দিয়েছেন। পুনরায় স্বীয় শক্তির পরিপূর্ণতা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হজরত ঈসা আ.-কে পিতাবিহীন সৃষ্টি করেছেন। লোকেরা যখন ঈসার দিকে সন্দেহের দৃষ্টি ফিরিয়ে বলতে লাগল, পিতাবিহীন কীভাবে তার জন্ম হলো? তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রথম সৃষ্টি ও প্রথম নির্মাণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ

আল্লাহ তাআলার নিকট ঈসার উদাহরণ আদমের মতো, যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।[৩০]

---

২৯ (সুরা সাজদা, ৭)

৩০ (সুরা আলে ইমরান, ৫৯)

অর্থাৎ ঈসাকে পিতাবিহীন সৃষ্টি করায় তোমাদের আশ্চর্য হওয়ার কী হলো? অথচ তোমরা তো আমার কুদরত ও প্রথম শিল্প সম্বন্ধে ভালো করেই অবগত আছ। আমি তোমাদের আদি পিতা আদমকে পিতামাতাবিহীন সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরা আমার প্রথম সৃষ্টিকে ভুলে গেছ, এজন্য আমি আমার পূর্বের সৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ঈসাকে পিতাহীন করে শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ আমি আমার অর্ধ শিল্প দেখিয়েছি, অথচ তোমরা আমার অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলে, কেননা আমি আদমকে অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছিলাম। এরপরেও কীভাবে তোমরা আমার অর্ধ থেকে সৃষ্ট তথা ঈসাকে অস্বীকার করতে পারো? এভাবে হজরত ঈসা আ.-এর আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ও জমিনে অবতরণ করার বিষয়টিও বোঝা সম্ভব, যেভাবে হজরত আদম আ.-কে সশরীরে জমিনে অবতরণ করা সম্ভব হয়েছিল এবং তেমনই হজরত ঈসা আ.-এর অবতরণ ও আসমানে উঠিয়ে নেওয়াও সম্ভব, কারণ ওঠানো ও অবতরণ করার রাস্তা ও দূরত্ব সবকিছু এক ও অভিন্ন।

উপায়-উপকরণের প্রভাব ফেলার বাস্তবতা

দার্শনিকেরা নিজেদের সীমাবদ্ধ ও কাঁচা অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণার ওপর ভিত্তি করে দাবি করে বসেছে, কারণ (cause) ছাড়া কোনো বস্তুর অস্তিত্ব লাভ অসম্ভব। দার্শনিকদের যদি সাবাব ও উপায়-উপকরণের প্রভাব ও মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকত, তাহলে তারা সাবাব ও উপায়-উপকরণকে 'মুসাব্বাবাত' (causal proof) তথা সাবাব ও উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট ফলাফলের অস্তিত্ব দানকারী, অর্থাৎ উপায়-উপকরণ কোনো বস্তু সৃষ্টি ও অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম, এমন অমূলক দাবি কখনোই করতে পারত না। আবিষ্কার ও উদ্ঘাটন আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ গুণ। আবিষ্কার ও উদ্ঘাটন কোনো নিষ্ক্রিয় জড়বস্তুর কাজ হতে পারে না। সুতরাং যেহেতু সাবাব ও উপায়-উপকরণ নিজেই একটি জড়বস্তু, তাই তা অন্য বস্তু সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না। বরং আবিষ্কার ও সৃষ্টি শুধু 'ফাআলুল্লিমা ইয়ুরিদ' তথা তিনি যা চান তা কার্যকর করেই থাকেন। এমন সত্তার কাজ।

উপায়-উপকরণের বিদ্যমানতা ও অস্তিত্ব যেমন আল্লাহ তাআলার দানকৃত, তেমনই উপায়-উপকরণের গুণাবলি ও প্রভাব এবং কার্যক্ষমতার সমস্ত গুণাগুণ ও অবস্থা-প্রকৃতি সবকিছুই আল্লাহ প্রদত্ত। উপায়-উপকরণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ইরাদা অনুযায়ী প্রভাব ফেলে থাকে। আল্লাহ তাআলা যেমন উপায়-উপকরণ বিলীন করতে

সক্ষম, তেমনই তিনি উপকরণের কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া অকেজো ও বেকার করে দিতেও সক্ষম।

প্রহার ও হত্যার ব্যাপারে প্রহারকারী ও হত্যাকারী ব্যতিরেকে তলোয়ার ও তিরকে মূল ঘাতক তথা হত্যা ও প্রহারকারী সাব্যস্ত করা যেমন নির্বুদ্ধিতা, তেমনই উপায়-উপকরণকে মূল কার্যকরকারী ও স্বয়ংক্রিয় প্রভাবধারী মনে করা নির্বুদ্ধিতা। মূল কর্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। আর এ সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম অবিনশ্বর চিরন্তন আল্লাহ তাআলার কুদরতে লুক্কায়িত গোপন শক্তি মাত্র। মোদ্দা কথা, উপায়-উপকরণের কার্যকারিতা এবং তা উপায়-উপকরণ হওয়া শুধুমাত্র দাবিমূলক। বাস্তবিক নয়। বরং উপায়-উপকরণ প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা ও ইরাদার অনুগামী।

চোখ ও কান, দেখা ও শ্রবণ করার উপকরণ ও মাধ্যম কিন্তু আল্লাহ তাআলারই সৃষ্ট। তাই তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন, বান্দা ততটুকু দেখতে ও শ্রবণ করতে পারে।

কোনো বস্তুর ব্যাপারে এ বস্তুটি অমুক বস্তুর সাবাব বা কারণ, অথবা এ কারণে এ ঘটনাটি ঘটেছে, অথবা উক্ত বস্তুটি এই কারণ বা উপকরণের ফলাফল ইত্যাদি বলা শুধু অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায়। যুক্তিনির্ভর বিবেকগ্রাহ্য অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, অমুক ওষুধ দ্বারা অমুক রোগ নিরাময় হয়, আগুন দগ্ধ করে, পানি ডুবিয়ে দেয় এ সমস্তকিছু পৌরাণিক জামানার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করে বলা হতো। অথচ এ বিষয়গুলো কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। সর্বজনবিদিত যে, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ধারণাভিত্তিক হয়ে থাকে। অকাট্য ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়। কারণ প্রথমত অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ এবং তা পরিবর্তন-পরিবর্ধনও হয়। এরপরেও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সর্বক্ষেত্রে এ হুকুম লাগিয়ে দেওয়া, যা আমাদের ধারণালব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপন্থী তা প্রকাশিত হওয়া ও অস্তিত্ব লাভ করা অসম্ভব, এই নীতি সুস্পষ্টরূপে সরাসরি বিবেকবুদ্ধিবিরোধী। আংশিক কোনো অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ব্যাপকভাবে এ বিধান কার্যকর করা, যে-সমস্ত বিষয় আমাদের উক্ত আংশিক অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাইরে তা অসম্ভব ও অবাস্তব হওয়া আবশ্যক হবে, এটা কি দিবালোকের ন্যায় পষ্ট নির্বুদ্ধিতা নয়? অতীতের ধারণাপ্রসূত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের তামাম কার্যাবলি সম্বন্ধে এ হুকুম বলবৎ করা, আগাম দিনগুলোতে অতীতের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী কোনো বস্তুর প্রকাশ

ঘটলে তা অসম্ভব ও অবাস্তব হিসেবে বিবেচ্য হবে, এটা মূর্খতা হওয়ার ব্যাপারে কি কোনো উচ্চবাচ্য হতে পারে?

সাবাব ও ইল্লাতের মাঝে পার্থক্য

সাবাব (سَبَب/cause) তার মুসাব্বাব (مسبَب/causal proof/উপায়-উপকরণ দ্বারা সৃষ্ট ফলাফল) বিদ্যমান হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। কিন্তু তা সাবাবের জন্য আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ সাবাব (কারণ বা উপায়-উপকরণ) পাওয়া গেলে বা বিদ্যমান থাকলে মুসাব্বাব (ফলাফল) পাওয়া যাবে বা বিদ্যমান থাকবে বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু ইল্লাত (عِلَّةٌ) এর ব্যতিক্রম, অর্থাৎ ইল্লাত পাওয়া গেলে মালুল (مَعْلُوْلٌ) তথা (ইল্লাতের কারণে সৃষ্ট ফলাফল) পাওয়া ও বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আগুন, পোড়ানো ও দগ্ধ করার সাবাব কিন্তু ইল্লাত নয়। কারণ আগুনের পোড়ানোর ক্রিয়া কখনো অপ্রকাশিত ও অবিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ আগুনের দগ্ধ করার ক্রিয়া কখনো নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। যেমন হজরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আগুনের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার শরীরে সামান্য আঁচও লাগেনি। সুতরাং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হলো, সমস্ত কাজের মূল ইল্লাত ও বাস্তবিক কর্তা মহান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও সংকল্প। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা ইহধামকে দারুল আসবাব বানিয়েছেন, এ কারণে প্রত্যেক কাজ প্রকাশিত ও সংঘটিত হওয়াকে বিশেষ কোনো মাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন।

দার্শনিক ও বস্তুবাদীরা সাবাব ও ইল্লাতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়নি। তাই তারা ইবরাহিম আ.-এর জন্য আগুন আরামদায়ক শীতল হয়ে যাওয়াও বুঝতে পারেনি।

মুসলমানদের বিশ্বাস মৌলিক দগ্ধকারী ও পোড়ানেওয়ালা হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি যদি চান, তাহলে আগুনবিহীনও পোড়াতে পারেন। তিনিই নিজ কুদরত দ্বারা আগুনকে জ্বালানোর একটি সাবাব ও উপকরণে রূপান্তরিত করেছেন। কাজেই তিনি ইচ্ছা করলে আগুনকে পোড়ানো থেকে বিরতও রাখতে পারেন। আগুন যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যমান হতে পারে না, তেমনইভাবে আগুনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও পোড়ানোর যোগ্যতা সবকিছুই আল্লাহ তাআলার হাতে। তার ইচ্ছার অধীন ও ইরাদার অনুগামী।

কোনো বস্তুর সমস্ত উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়

বিবেকবুদ্ধি যতই তীক্ষ্ম ও শাণিত এবং সূক্ষ্মদর্শী হোক না কেন, সর্বাবস্থায় মানুষের লব্ধ জ্ঞান অত্যন্ত সামান্য পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। মানুষের লব্ধ জ্ঞান কখনোই ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। বিবেকবুদ্ধি কোনো বস্তুর ব্যাপারে এ দাবি করতে পারে না যে, সে কোনো বস্তুর সমস্ত উপায়-উপকরণ, শর্ত-শরায়েত ও প্রতিবন্ধকতার জ্ঞান পুরোপুরি সুচারুরূপে আয়ত্ত করে নিয়েছে। কারণ এক বস্তুর উপায়-উপকরণ একাধিক হওয়ার কারণে তা বিদ্যমান ও অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত-শরায়েত এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। অথচ আমরা এর মধ্য থেকে আংশিক বিষয়ের জ্ঞান রাখি আর এর আংশিক বরং অধিকাংশের ব্যাপারে থাকি অগা এবং অজ্ঞ।

দুনিয়াতে অসংখ্য চাক্ষুষ প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে এক বস্তুর উপায়-উপকরণ এক রকমের হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত কোনো প্রতিবন্ধকতা অথবা কোনো শর্ত অনুপস্থিতির কারণে উক্ত বস্তু প্রকাশিত হতে পারে না। সুতরাং যারা সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী অলৌকিক বিষয়াবলিকে অস্বীকার করে, তারা যেন নিজেদেরকে জ্ঞানের অপরিব্যাপ্ত কূলকিনারাহীন সমুদ্দুর মনে করে এক হাত জিহ্বা নাচিয়ে বলতে চায়, আমাদের এই তমশাচ্ছন্ন ও বিকলাঙ্গ অপূর্ণ জ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত উপায়-উপকরণ ও শর্ত-শরায়েত এবং বস্তুনিচয়ের তাত্ত্বিকতার সকল জ্ঞানবিজ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছে। তাই আমরা হুকুম লাগিয়েছি যে, এ সমস্ত অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলি প্রকাশ পাওয়া শুধু অসম্ভবই নয় বরং অবাস্তবও বটে।

জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ বলুন! এ দাবি কি প্রতারণামূলক ও কাঁচা বুদ্ধির বাচ্চাসুলভ অমূলক দাবি নয়? সায়েন্স ফিকশনের বড় বড় প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ ও বিদগ্ধজনেরা বিনা বাক্যে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে ঘোষণা করছে যে, কানুনে ইলাহি তথা আল্লাহ তাআলার নিয়মনীতি ও পন্থা-পদ্ধতির পরিব্যাপ্তি তো দূরের কথা, বরং তাঁর সাধারণ কোনো বিষয়ের ওপর পরিপূর্ণ আয়ত্ত সাধন করাও সম্ভব নয়। বিজ্ঞজনদের এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনো বস্তু তাদের জ্ঞানের নির্দিষ্ট গণ্ডি পার হলেই তারা হাঁকডাক ছেড়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। সারকথা পৃথিবীর কোনো বিবেকবুদ্ধিই এ দাবি করতে সক্ষম নয় যে, সে কুদরতের

সমস্ত নিয়মকানুন, জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করে নিয়েছে। তাই তাদের বিচারবিশ্লেষণের মানদণ্ডে যা ভুল প্রমাণিত হবে, তা অবশ্যই ভুল ও অবাস্তব হিসেবে গণ্য হবে।

সাবাব ও ইস্লাত নিয়ে বাগযুদ্ধ করা ধর্মের উদ্দেশ্য ও স্বভাববিরোধী

ধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্য ও স্বভাব হলো কুদরতের প্রকাশ্য বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে আল্লাহ তাআলার মারিফত ও পরিচয় অর্জন করা। কেননা আল্লাহ তাআলার সঠিক পরিচয় লাভ করার দ্বারা তাঁর বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও ভালোবাসার প্রতি সচেতন বোধ সৃষ্টি হয়। আর তাঁর প্রতি ভালোবাসার এই সচেতন বোধই আনুগত্য করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

সুতরাং যদি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের কারণ ও উপকরণ নিয়ে বাগযুদ্ধ করা হয়, তাহলে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য চুকে যাবে। কাজেই এ ধরনের আলোচনা জনসাধারণের জন্য শুধু অনুপকারীই নয়, বরং অনর্থক ও ক্ষতিকরও বটে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

অলৌকিক বিষয়াবলি অস্বীকারকারীদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, মুজিজা ও কারামত কুদরতি নিয়মকানুনপরিপন্থী।

এর উত্তরে আমরা বলব, আপনারা যে বলে বেড়ান, অলৌকিক বিষয়াবলি আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত নিয়মকানুনবিরোধী, এখন আমাদেরকে বলুন! আপনাদের নিকট এমন কোন পরিপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত নীতিমালা রয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে আপনারা মুখে ফেনা তুলে বলছেন, অলৌকিক বিষয়াবলি আল্লাহ তাআলার নিয়মকানুনপরিপন্থী? আপনারা আমাদেরকে বাতলে দিন, কুদরতের নীতিমালা কী এবং আমাদেরকে আসমান অথবা জমিনের কোনো কিতাবে বা বইপুস্তকে কুদরতি আইনকানুনের ফিরিস্তি ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ দেখিয়ে বলুন এগুলো কুদরতি আইনকানুন?

এমন কোনো কিতাব না আসমান থেকে কোনো কালে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর না উক্ত বিষয়বস্তুর ওপর পৃথিবীতে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়েছে বা হতে পারে। একজন মানুষ আপাদমস্তক ভুলক্রুটির মাঝে সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ দেমাগ ও স্বল্প বোধবুদ্ধির

অধিকারী হয়ে মহামহীয়ান আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের আইনকানুনকে কীভাবে বর্ণনা করতে পারে? কার সাধ্য রয়েছে ওই অসীম সীমাহীন কুদরতকে কোনো আইনকানুন বা মূলনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নির্ধারণ করে দেবে? কুদরতের আইনকানুন আমরা যা সর্বক্ষণ পৃথিবীতে অবলোকন করে থাকি এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। আর মানুষের জ্ঞানের পরিধি সামান্য কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের বাইরে নয়। জীবনভর আমরা যা-কিছু দেখি এ সবকিছুই ইন্দ্রিয়জগতের বস্তু হিসেবে দেখে থাকি।

অথচ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দেখার সময় আমরা অসংখ্য অতীন্দ্রিয় বস্তুর মধ্যে আল্লাহ তাআলার কুদরতের আইনকানুনকে কীভাবে জানতে পারব? একজন মানুষের আয়ু তো অল্পকয়েক দিনের মাত্র। যদি পৃথিবীর সমস্ত আয়ু একত্র করে এর সাথে সকল অভিজ্ঞতা যোগ করা হয়, তবুও এ সীমাবদ্ধ ধারণালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা আল্লাহ তাআলার কুদরতি আইনকানুন আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। হায় আফসোস! আমাদেরকে কেউ যদি বাতলে দিত, পৃথিবীতে এমন কোন কিতাব রয়েছে যাতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের আইনকানুন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং উক্ত কিতাব সব ধরনের বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে পবিত্র এবং সাথে সাথে এ বক্তব্য প্রদানকারীরও উক্ত কিতাব আদ্যোপান্ত মুখস্থ রয়েছে? যদি তর্কের খাতিরে সামান্য সময় মেনেও নেওয়া হয়, আল্লাহ তাআলার কুদরত ও শক্তিসংবলিত কোনো কিতাব রচনা করা হয়েছে, তাহলে সেটিও তো তাঁরই লেখা গ্রন্থ হবে। মানবরচিত কোনো গ্রন্থ হবে না। আর যে নিয়মনীতি ও আইনকানুন আল্লাহ তাআলা লিপিবদ্ধ করে বান্দাদেরকে দান করেছেন, কেউ তাতে কোনো রদবদলও করতে পারবে না।

জটিল ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ বিষয় হলো, নাস্তিক ও মুজিজা অস্বীকারকারীরা (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলাকে পার্লামেন্ট সদস্যের মতো মনে করে ভেবে থাকে, তাঁরও নিয়মকানুন পরিবর্তন করার কোনো অধিকার নেই। ইসলাম এমন দুর্বল খোদাকে সমর্থন করে না। কোনো মুজিজাই আল্লাহ তাআলার আইনকানুনপরিপন্থী নয়, বরং মুজিজা নির্মল পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল আয়নার মতো, যার দ্বারা কুদরতের চেহারা আরও অধিক স্বচ্ছ ও নিকট থেকে অবলোকন করা যায়। এমনইভাবে সমস্ত সাবাব ও আসবাব এবং উপায়-উপকরণও আল্লাহ তাআলার কুদরতের আয়না ও প্রকাশস্থল। কিন্তু মুজিজা ও কারামত উপায়-উপকরণ থেকেও বড় কুদরতের আয়না, যা দেখা মাত্রই আল্লাহ তাআলার কুদরত, শক্তিক্ষমতা ও বড়ত্ব এবং নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

দৈনন্দিন কত বিস্ময়কর অশ্রুতপূর্ব বিষয়াবলি ঘটে থাকে, তাহলে কি এ অভিনব ও নান্দনিক ঘটনাবলির সবগুলোই আল্লাহ তাআলার কুদরতি নিয়মনীতির পরিপন্থী ও শক্তিসামর্থ্যের ঊর্ধ্বে বলে গণ্য হবে? হে মানুষ! মৌলজগৎ ও বিশ্বজগতের বিরল ঘটনাবলির দিকে দৃষ্টি রাখো! অতঃপর মিশ্রজগৎ, তারপর তৃণজগৎ ও প্রাণিজগৎ এবং জড়জগতের দিকে তাকাও! এরপর মনুষ্যজগতের নান্দনিক বিষয়াবলির দিকে দৃষ্টি ফেরাও! খুব ভালো করে দেখো এগুলোর প্রত্যেকটি স্তরই স্বীয় নিম্নস্তরের দিকে লক্ষ করে একে অন্যের চেয়ে উন্নততর ও অভিনব এবং অনুপম বিষয়াবলির কিসসা বনে রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ যদি ধরে নেওয়া হয় প্রাণিজগৎ স্বীয় বিবেকবুদ্ধির অপূর্ণতার কারণে মনুষ্যজগতের আশ্চর্য ও অনভিপ্রেত অলৌকিক ঘটনাবলি অস্বীকার করে বসে এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারিশমা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মশকরা করে বলে বেড়ায়, মানুষের এ সমস্ত অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলো স্বভাবজাত নিয়মনীতি ও আল্লাহ তাআলার কুদরতি আইনকানুনপরিপন্থী, তাহলে কি তা বিবেকবানদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে বা প্রাণিজগতের এই অস্বীকৃত ও হঠকারিতার মূল্যায়ন করা হবে?

সুতরাং প্রাণিজগৎ ও মনুষ্যজগতের মাঝে শ্রেণি ও স্তরভেদের যে সম্পর্ক রয়েছে, ওই একই সম্পর্ক রয়েছে বস্তুজগৎ ও আত্মিকজগৎ এবং দার্শনিক ও আম্বিয়া কিরাম আ.-এর মাঝে। মনুষ্যজগতের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন প্রাণিজগতের চেয়ে অনন্য ও শ্রেষ্ঠতর, তেমনই অধ্যাত্মজগতের শ্রেষ্ঠত্ব বস্তুজগতের শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে অধিক উন্নত ও সমৃদ্ধ।

কুদরত ও আদতের (অভ্যাস) মাঝে পার্থক্য

কুদরত (قدرة) ও আদত (عادة) সাধারণত এ দুটি শব্দের মাঝে অধিকাংশ মানুষ পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। অথচ এ দুটি শব্দের মাঝে ব্যবধান করতে তেমন বেশি বেগ পোহাতে হয় না। কেননা এ দুটি শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ ও মর্মের দিকে লক্ষ করলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কুদরত অর্থ কোনো কাজ করার ক্ষমতা ও সক্ষমতা রাখা। আর আদত অর্থ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো কাজ করতে থাকা। সুস্পষ্টরূপেই বোঝা যায়, দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু।

মানুষের মধ্যে আলাদা আলাদা দুটি গুণ অর্থাৎ একটি কুদরত ও একটি আদত রয়েছে। এক বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করাকে আদত বলে। আর উক্ত বিশেষ নিয়মপরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারাকে কুদরত বলে। এভাবে বুঝে নিতে হবে,

আল্লাহ তাআলার একটি আদত ও একটি কুদরত রয়েছে। পৃথিবীর বেশিরভাগ বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যাহত ও চিরাচরিত আদত তথা অভ্যাস ও সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কোনো কল্যাণ ও হিকমতের দিকে লক্ষ করে সাধারণ নিয়মপরিপন্থী বিষয়ও তিনি প্রকাশ করেন। কোনো কাজ অভ্যাস ও সাধারণ নিয়মপরিপন্থী করা কুদরত থেকে বের হয়ে যাওয়া বোঝায় না। উপায়-উপকরণের সৃষ্ট ফলাফল অর্থাৎ কোনো কারণ ঘটানোর পর কোনো বস্তু সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম। আর কোনো কোনো জায়গায় উপায়-উপকরণ ছাড়া কোনো বস্তু তৈরি করা ও ঘটানো তাঁর কুদরত। সুতরাং অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনাবলি আদত তথা সাধারণ নিয়মপরিপন্থী হতে পারে, কিন্তু কুদরতি নিয়মকানুনপরিপন্থী কখনোই হতে পারে না।

কাজেই মুজিজাকে কুদরতের নিয়মনীতিপরিপন্থী বলা কোনোভাবেই সঠিক ও বিশুদ্ধ নয়। কোনো বস্তু সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী হওয়ার কারণে অসম্ভব ও অবান্তর জ্ঞান করা কোনো মূলনীতি দ্বারাই প্রমাণিত নয়। মুজিজা অস্বীকারকারীরা মূলত আদত ও কুদরতের মাঝে ব্যবধান নির্ণয় করতে সক্ষম হয়নি, এ কারণে অভ্যাস ও সাধারণ নিয়মপরিপন্থী বিষয়কে কুদরতের পরিপন্থী ভেবে বসেছে।

আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম হলো বিশেষ এক পদ্ধতিতে জন্মদান করা, যেমন প্রথমে নুতফা তথা শুক্রাণু, এরপর আলাকা (রক্তপিণ্ড বা জোঁকের মতো ঝুলন্ত মাংসপিণ্ড), অতঃপর চর্বণযোগ্য মাংসপিণ্ডের ন্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি ধাপে সৃষ্টি করা। কিন্তু এ নিয়মপদ্ধতি দ্বারা আবশ্যক হয় না শুক্রাণু ব্যতীত সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও শক্তির বাইরে। কুদরত সাধারণ নিয়মনীতি ও অভ্যাস থেকে অনন্যতর ও অতি উঁচুমানের হয়ে থাকে। কেননা কুদরত সমস্ত সাবাব ও আসবাব এবং সকল উপায়-উপকরণের ওপর কর্তৃত্বশীল ও ফরমাবরদার। আল্লাহর পানাহ! আসবাব ও উপায়-উপকরণ কি কখনো অবিনশ্বর কুদরতের পা শিকলবদ্ধ করে আটকে রাখতে পারে?

সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম

সাধারণ নিয়ম আবার দুই প্রকারে বিভক্ত। একটি সাধারণ নিয়ম, অন্যটি বিশেষ নিয়ম। রাজাবাদশাদের উজির-নাজিরদের সাথে এক ধরনের আচরণ হয়ে থাকে আর সাধারণ কর্মচারীদের সাথে হয়ে থাকে অন্যরকম। এভাবেই আল্লাহ তাআলা নবিদের সাথে এক ধরনের আচরণ করেন আর সাধারণ মানুষদের সাথে করেন অন্যরকম।

তথা নবিদের সাথে আল্লাহ তাআলার আচরণ সাধারণ মানুষদের থেকে মর্যাদাপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। সুতরাং যে-সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলি হজরত আম্বিয়া কিরাম আ.-এর সত্যায়নস্বরূপ প্রকাশিত হয়, তা শুধু সাধারণ নিয়ম ও অভ্যাস থেকে ব্যতিক্রম ও ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু বিশেষ নিয়মনীতির পরিপন্থী কখনোই হতে পারে না। কারণ, বিশেষ ব্যক্তি অর্থাৎ নবি ও নৈকট্যশীলদের সাথে আচরণের সঠিক নীতিপন্থাই হলো তাদেরকে এ ধরনের মুজিজা ও অলৌকিক ঘটনাবলি দান করে সম্মানিত করা হবে। বরং মুজিজা ও অলৌকিক বিষয়াবলি তাদের হাতে প্রকাশিত না হওয়াটাই হিকমতের পরিপন্থী। কেননা স্তরভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং উস্তাদ-ছাত্রের সাথে পৃথক পৃথক আচরণ করা বিবেকের দাবি, স্বভাবজাত বদান্যতা এবং সুস্পষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও হিকমতের পরিচায়ক। বাদশাহ স্বীয় সভাসদ ও উজির-নাজিরদের সাথে এক ধরনের আচরণ করবে আর সাধারণ আমলা ও প্রজাদের সাথে ভিন্নরূপ আচরণ করবে এটাই স্বাভাবিক।

দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাবলিতে প্রাকৃতিক অপ্রত্যাশিত ঘটনার ব্যাপারে ভিন্ন একটি অধ্যায় রয়েছে। এতে সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী ও নির্দিষ্ট স্বভাবজাত নিয়মনীতি থেকে আলাদা ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ঘটনাগুলোকে উপায়-উপকরণ থেকে সৃষ্ট বস্তুর বহির্ভূত মনে করা হয়। এ সমস্ত ঘটনাগুলো যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে দার্শনিকরা তা নিয়ে টুঁ শব্দ করা ব্যতিরেকে পুলকিতচিত্তে নির্দ্বিধায় শুধু মেনেই নেয় না, বরং এর বিভিন্ন ধরনের আকাশকুসুম ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু মুজিজা ও কারামতের প্রামাণ্যতার সাক্ষী যদি ধারাবাহিক ও পরম্পরাসূত্রেও নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তবুও তাদের তা মিথ্যা প্রতিপন্ন ও ভুল সাব্যস্ত করা এবং এ নিয়ে হঠকারিতা করার জন্য নাভিশ্বাস ওঠে।

ফ্রান্সের একজন দার্শনিক 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিজ্ঞান' গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, একজন মহিলার স্তন তার বাম পায়ের রানের ওপর ছিল এবং সে ওখানকার স্তন থেকেই তার বাচ্চাকে দুধ পান করাতো। এই মহিলাটি ১৮২৭ সালে প্যারিসের গবেষকদের সাথে সাক্ষাৎ করে। এই ধরনের অলৌকিক ঘটনার সকলেই প্রবক্তা ও সমর্থক। কিন্তু যখন কোনো অলৌকিক ঘটনা ও সাধারণ নিয়মপরিপন্থী বিষয়কে নবিদের মুজিজা ও অলিদের কারামত শিরোনামে উল্লেখ করা হয়, তখন এরাই তা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ে।

অলৌকিক ঘটনাবলি যদি অসম্ভব হয়েও থাকে, তাহলে তা সাধারণ লোকদের শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে অসম্ভব হবে, কিন্তু একে অধ্যাত্মশক্তির দিক থেকে অসম্ভব মনে করা নাদানি বইকি। আর মহামহিম আল্লাহ তাআলার শক্তি ও কুদরতের দিক থেকে অসম্ভব মনে করা তো পুরোপুরিই আহম্মকি।

যে বস্তু যে স্তরের কর্তা বা প্রভাবধারী, তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াও উক্ত স্তর অনুপাতে ঘটে। একজন মানুষ একসাথে দশ মন ওজনের কোনো বস্তু ওঠাতে সক্ষম নয়, কিন্তু একটি রেলগাড়ির ইঞ্জিন হাজার টন ভারী বস্তু নিজের পিঠে চেপে সাধারণ বৈদ্যুতিক শক্তিতে মুহূর্তের মধ্যে শত শত মাইল দূরে বহন করে নিয়ে যায়। অথচ তা হাজার হাজার মানুষ একসাথে মিলেও নিয়ে যেতে সক্ষম নয়।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

অলৌকিক ঘটনাবলি মান্য করা ধারণাপূজা এবং মান্যকারীরা নির্বোধ ও অলীক কল্পনাপূজারি নয়। বরং তা মেনে নেওয়াই হলো উচ্চ পর্যায়ের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা। বরং এত বড় বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা যে, তার সামনে বড় বড় বিজ্ঞাতিবিজ্ঞ দার্শনিকেরাও হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে।

কবি বলেন,

> জালিনুসের হাজার হাজার চিকিৎসক ঈসা আ.-এর এক ফুঁ-এর সামনে হাপিত্যেশ করে বেড়িয়েছে।[৩১]

হজরত আম্বিয়া কিরাম আ.-এর থেকে যে-সমস্ত অলৌকিক বিষয়াবলি এবং জ্ঞানবিদ্যা প্রকাশ পেয়েছে তা বাস্তবিক অর্থেই এমন জ্ঞানবিদ্যা ও ইলম-হিকমত ছিল, যা মানুষের কায়া পরিবর্তন করে অজ্ঞ ও অলীক কল্পনাপূজারিদেরকে ভ্রান্ত ধ্যানধারণা ও খেয়ালখুশির বিধ্বস্ত গহ্বর থেকে বের করে ইলম ও হিকমতের প্রাসাদে এনে বসিয়েছিল।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর

---

৩১ ঈসা আ. আল্লাহর কালাম পাঠ করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতেন, যার সামনে তৎকালীন প্রসিদ্ধ হাকিম ও চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ ছিল।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল অলৌকিক বিষয়াবলি মানলে ও স্বীকৃতি দিলে পৃথিবীর নিজাম ও ব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খল এবং ভারসাম্যহীন হয়ে পড়া আবশ্যক হয়ে যাবে এবং উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম থেকে মানুষের নির্ভরতা উবে যাবে।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, রেলগাড়ি লাইনচ্যুত ও পুল ভেঙে অ্যাকসিডেন্ট করা এবং ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ কুইনাইন সেবনে হঠাৎ জ্বর বেড়ে যাওয়ার কারণে যেমন মানুষের রেলগাড়ি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে আস্থা ও আত্মনির্ভরতা দূর হয়ে যায়নি যে, তারা ভ্রমণ করা ও চিকিৎসা গ্রহণ করা ছেড়ে দিয়েছে। তেমনই অলৌকিক কোনো বিষয় প্রকাশ পাওয়ার দ্বারা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার মাঝে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তো হয়ই না, বরং অলৌকিক বিষয়াবলির প্রকাশ আমাদের ব্যর্থতার চিকিৎসাস্বরূপ। যাতে করে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি উদাসীন হয়ে গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে না দিই। আর ইখতিলাল তথা (বিশৃঙ্খল অর্থ) স্বীয় ক্ষমতাকে অপাত্রে ও ভুল কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা। বান্দার ক্ষেত্রে তো এটা সম্ভব বরং ঘটেও থাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সত্তা এর থেকে পূত ও পবিত্র। মুজিজা অস্বীকারকারীরা তো প্রাকৃতিক অপ্রত্যাশিত বিষয়াবলির ওপর ইমান রাখে। এখন যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, তোমাদের এ প্রাকৃতিক অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলি মান্য করার দ্বারা কি পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার ওপর কোনো আঘাত পৌঁছায় না? এ ধরনের অদ্ভুত ও বিস্ময়াপন্ন ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার কারণে তোমাদের বানানো সমতার মাঝে কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না?

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর

অলৌকিক ঘটনাবলির বিদ্যমানতা উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক নয়। কারণ পদোন্নতি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধ হওয়ার চাবিকাঠি মানুষের সাধ্যের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অলৌকিক ঘটনাবলির বিদ্যমান থাকা ও প্রকাশ পাওয়া, না মানুষের সাধ্যে রয়েছে, আর না তা বিরত রাখা তার করায়ত্তে রয়েছে। বরং অলৌকিক ঘটনাবলির প্রকাশ উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম হয়ে আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও মারিফত বৃদ্ধি করতে থাকে। কাজেই অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হওয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মাঝে প্রতিবন্ধক নয়।

মুজিজা; নবুয়ত ও রিসালাতের প্রমাণ

বোধবুদ্ধির দিক দিয়ে প্রত্যেক দাবির জন্যই দলিল-প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। হজরত আম্বিয়া কিরাম আ. যে নবুয়ত ও রিসালাতের দাবি করে বলে থাকেন, আমরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজীবের মাঝে সেতুবন্ধন, এই আজিমুশ শান দাবির পক্ষেও অকাট্য ও জোড়ালো দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

তাদের এ দাবির দলিল-প্রমাণ হলো, মুজিজা তথা অলৌকিক ঘটনাবলি ও সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী অনভিপ্রেত বিষয়াবলি। যে অলৌকিক ঘটনাবলি বাহ্যিক কোনো উপায়-উপকরণ ছাড়া আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের হস্ত মুবারকে প্রকাশিত হয়ে সমস্ত বিশ্বকে এর উদাহরণ পেশ করতে অক্ষম করে দেয় তাকে মুজিজা বলে।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে উপায়-উপকরণের জগৎ বানিয়েছেন। তাই পৃথিবীতে তাঁর নীতিপন্থা হলো, কোনো বস্তুকে উপায়-উপকরণ ঘটানো ব্যতীত সৃষ্টি করেন না। আর এটাকেই আদত তথা অভ্যাস বা সাধারণ নিয়ম বলে। তবে কখনো তিনি অভ্যাস ভেঙে নিজ কুদরতে বাহ্যিক কোনো উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে নবিদের হাতে অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ করে থাকেন। এ অলৌকিক ঘটনাবলিকে দেখে মানুষ যেন বুঝে নেয়, এটা আল্লাহ তাআলার কাজ। নবি ও রাসুলদের সত্তাগত কাজ নয়। কেননা উপায়-উপকরণ বাদে কোনোকিছু ঘটানো বান্দার সাধ্যের বাইরে। বান্দাদের জন্য উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে কোনোকিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কাজেই মুজিজাকে দেখা মাত্রই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়, এ ব্যক্তিটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঐশী ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাকে সত্যায়ন করার জন্যই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলি তাঁর হাতে প্রকাশ পেয়েছে, যা নিঃসন্দেহে মানবীয় শক্তিসামর্থ্যের ঊর্ধ্বে। সুতরাং এর দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতীয়মান হয়, নবিদের হাতের আড়ালে কুদরতের গোপন হাত কাজ করে। নবিদের হাত থেকে যা-কিছু প্রকাশ পায়, বাস্তবিক অর্থে তা আল্লাহ তাআলার কাজ। নবিদের কাজ নয়। কেননা আল্লাহ তাআলার কুদরতে নবিদের ইচ্ছাক্ষমতার কোনো দখলদারি নেই। এ কারণেই কোনো নবির সাধ্যও নেই যে, তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা মুজিজা প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। কবি বলেন,

আল্লাহ বলেন, যখন তুমি তির ছুড়েছ, তুমি যে তা ছুড়ছ না,

ছুড়ছে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, তা কখনো ভুলবে না।

আমরা যখন তির ছুড়েছি, আসল কাজি আমরা না,

কাজের কাজ তো আল্লাহ করেন, তিরধনুক সব বাহানা। (ভাবার্থ)

সুতরাং নবিদের হাতে যে-সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হয়, তা সাধারণত মানবীয় শক্তিসামর্থ্য ও সাধ্যের বাইরে হয়ে থাকে। আর এটাই হলো নবিদের কর্মগত মুজিজা। কর্মগত মুজিজার অনুরূপ কখনো কখনো নবিদের মুখ থেকে এমন কিছু খবরাখবর ও ভবিষ্যদবাণী প্রকাশিত হয়, যা মানবীয় জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রকাশ করতে অক্ষম। একেই বলে নবিদের জ্ঞানগত মুজিজা। কোনো ধরনের উপলক্ষ ও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে অদৃশ্যের বিষয়াবলির সংবাদ দেওয়া প্রমাণ করে, অদৃশ্যের সংবাদদাতা মহান আল্লাহ তাআলার সাথে ও অদৃশ্যজগতের সাথে নবিদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ তাআলার অবগত করার দ্বারা তারা অদৃশ্যের সংবাদ জানান দিতে পারেন। নবিগণ ব্যতীত এমন ভবিষ্যদবাণী অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়।

বাদশাহ কাউকে মন্ত্রী, দূত বা বিচারক বানিয়ে কোথাও প্রেরণ করলে তাকে কিছু বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্রীয় নিদর্শন দান করবে এটাই স্বাভাবিক। এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদমর্যাদা দ্বারা তাকে সম্মানিত করবে যা অন্যদের কল্পনাতীত। কারণ দেখা মাত্রই যেন মানুষ বুঝতে পারে, তিনি বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। কাজেই লোকেরা তখন তার আনুগত্য করে এবং বুঝে নেয় এ নিদর্শনাবলি উক্ত ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্ট নয়, বরং রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে মন্ত্রিত্ব দান বা বার্তাবাহক বানানোর কারণে তাকে এ নিদর্শনাবলি দেওয়া হয়েছে।

এর ওপর ভিত্তি করেই প্রতীয়মান হয়, রাজাবাদশারা কখনো কখনো মন্ত্রী ও বার্তাবাহককে নিজেদের গোপন রহস্য অবগত করে থাকেন। যাতে করে তারা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কল্যাণ অনুপাতে উক্ত গোপন সংবাদ দ্বারা লোকদেরকে সতর্কতামূলক ভীতিপ্রদর্শন করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। বুদ্ধিমানেরা তখন বুঝে নেয়, তিনি বাদশাহর একজন বিশেষ নৈকট্যশীল ব্যক্তি। এমনইভাবে আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুলদেরকে কখনো-সখনো ওহির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় অদৃশ্যজগতের কিছু খবরাখবর অবগত করে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে থাকেন, নবিদের সাথে অদৃশ্যজগতের বিশেষ এক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার একজন নৈকট্যশীল সম্মানিত বান্দা হওয়ার কারণে তাকে অদৃশ্যের ইশারা-ইঙ্গিত অবগত করা হয়। কেননা নবি-রাসুলগণ যে অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে থাকেন, তা

বুদ্ধিনির্ভর এবং ধারণাপ্রসূত অভিজ্ঞতার চেয়ে হাজার গুণ বরং তুলনাহীন অতি উঁচুমানের মযাদাপূর্ণ হয়ে থাকে। মানুষ তা শ্রবণ করা মাত্রই সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেয়, এ অদৃশ্যের সংবাদ ও অলৌকিক ঘটনাবলি শুধু অদৃষ্টের সংবাদদাতা আল্লাহ তাআলার অবগত করার দ্বারাই জানা সম্ভব হয়েছে। কর্মগত মুজিজা যেমনইভাবে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও নিদর্শন হয়ে থাকে, তেমনই জ্ঞানগত অলৌকিক ঘটনাবলিও আল্লাহ তাআলার ইলম ও হিকমতের নিদর্শন হয়ে থাকে, যা শ্রবণ করা মাত্রই হৃদয়ে নবি-রাসুলদের সত্য হওয়ার আভাস আপনা-আপনিই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ মুজিজার প্রভাব এতটা প্রবল ও বিস্তৃত হয়ে থাকে যে, এর সামনে কোনো পা স্থির হয়ে টিকে থাকতে পারে না। ইচ্ছার লাগাম কেউ ধরে রাখতে সক্ষম হয় না, বরং অজান্তেই হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায়। তবে যাদের অন্তরে কপটতা, বিদ্বেষ ও পার্থিব ধনসম্পদের লোভ-লালসা রয়েছে, এরা ব্যতীত মুজিজা দেখার পরে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে কেউ বিরত থাকতে পারে না। সুতরাং যারা মুজিজা স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও ইমান আনয়ন করে না, তাহলে এর কারণ শুধু হিংসা-বিদ্বেষ ও চিরস্থায়ী ব্যর্থতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

মুজিজা নবুয়তের দলিল হওয়ার প্রমাণ কুরআন কারিম

কুরআনে কারিমে জায়গায় জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে, কাফিররা আম্বিয়া কিরাম আ.-এর নিকট নবুয়ত ও রিসালাতের প্রমাণ পেশ করার জন্য মুজিজা প্রকাশ করার দাবি করত।

কুরআনে কারিমে এসেছে, কাফিররা নবিদেরকে বলত,

قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। তোমরা আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষ যাদেরকে ইবাদত করত তাদের থেকে বিরত রাখতে চাও, সুতরাং

তোমরা তোমাদের নবুয়ত ও রিসালাতের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে এসো, অর্থাৎ কোনো মুজিজা এনে দেখাও।[৩২]

সামুদ সম্প্রদায় নিজেদের রাসুল সালিহ আ.-কে বলে বসল,

مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

তুমি তো কেবল আমাদের মতোই একজন মানুষ। সুতরাং কোনো মুজিজা এবং নিদর্শন দেখাও যদি তুমি নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হও। (হজরত সালিহ আ. উত্তর দিলেন) এই উঠনী (তোমাদেরকে মুজিজাস্বরূপ দেওয়া হলো), তার জন্য পানি পানের এক পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা।[৩৩]

এ উষ্ট্রীটিকে অলৌকিকভাবে কোনো উপায়-উপকরণ ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ পাথর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ফিরআউন বলল,

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

হে মুসা! তুমি যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো মুজিজা এনেই থাকো, তাহলে তা পেশ করো, যদি তুমি তোমার নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হও। তখন হজরত মুসা আ. স্বীয় লাঠি জমিনের ওপর ছেড়ে দিলে আকস্মিক তা পষ্ট অজগরে রূপ নেয়। আর যখন হাতকে বগল থেকে বের করলেন, তা দর্শকদের সামনে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল।[৩৪]

---

৩২ (সুরা ইবরাহিম, ১০)

৩৩ (সুরা শুআরা, ১৫৪-১৫৫)

৩৪ (সুরা আরাফ, ১০৬-১০৮)

উক্ত আয়াতগুলোতে 'আয়াত' (اَيَة) শব্দগুলো মুজিজা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়াত শব্দটি কুরআন ও হাদিসে তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক অর্থে কুরআনের আয়াত বোঝায়। যেমন, ইরশাদ হয়েছে,

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

তারা রাত্রিকালে আল্লাহ তাআলার কালামে পাকের আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। [৩৫]

এই ধরনের আয়াতে 'আয়াত' (اَيَةٌ) শব্দ ব্যবহৃত হলে কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য হবে।

দ্বিতীয় অর্থ, নসিহা, উপদেশ বা শিক্ষাগ্রহণ। যেমন ফিরআউনের নীলনদে নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

অতএব আমি আজকে তোমার লাশকে পানি থেকে বের করে উপত্যকায় উঠিয়ে দেবো, যাতে করে তা তোমার পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকে।[৩৬]

তৃতীয়, মুজিজা ও নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা সামনে কিছু আয়াত তুলে ধরব, যাতে 'আয়াত' (اَيَةٌ) শব্দটি মুজিজা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

নিশ্চয় আমি মুসাকে ফিরআউন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে আমার দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমেত ও স্পষ্ট নিদর্শন অর্থাৎ মুজিজাসহ প্রেরণ করেছি।[৩৭]

---

৩৫ (সুরা আলে ইমরান, ১১৩)

৩৬ (সুরা ইউনুস, ৯২)

৩৭ (সুরা হুদ, ৯৬)

২

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

অতি অবশ্যই আমি মুসাকে নয়টি সুস্পষ্ট আয়াত তথা মুজিজা দান করেছি।[৩৮]

৩.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ

আর আমি তাদের ওপর পাঠালাম প্লাবন, টিড্ডি, কেশকীট, ভেক মণ্ডুক ও রক্তকে সুস্পষ্ট নিদর্শন তথা মুজিজাস্বরূপ।[৩৯]

৪.

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ

অতঃপর যখন মুসা তাদের নিকট দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত তথা মুজিজা নিয়ে আগমন করল।[৪০]

৫.

فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ

এবং যখন মুসা তাদের নিকট আমার আয়াত তথা মুজিজা নিয়ে গেল, তারা তা নিয়ে তখন ঠাট্টা-বিদ্রুপে-অট্টহাসিতে মেতে উঠল।[৪১]

৬.

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

---

৩৮ (সুরা বনি ইসরাইল, ১০১)

৩৯ (সুরা আরাফ, ১৩৩)

৪০ (সুরা কাসাস, ৩৬)

৪১ (সুরা যুখরুফ, ৪৭)

আমি তাকে (ফিরআউনকে) আমার সমস্ত আয়াত তথা মুজিজা দেখিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং অস্বীকার করল।[৪২]

৭.

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا

আমি তাদেরকে এমন কোনো নিদর্শন তথা মুজিজা দেখাইনি, যা তার অনুরূপ নিদর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।[৪৩]

৮.

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

তারা বলল, আমাদেরকে জাদুমোহ করার জন্য তুমি যেকোনো নিদর্শন আমাদের নিকটে পেশ করো না কেন, আমরা তোমার ওপর ইমান আনব না।[৪৪]

৯.

وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا

তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন তথা মুজিজার ওপর ইমান এনেছি, যখন তা আমাদের নিকটে এসেছে।[৪৫]

১০.

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً

---

৪২ (সুরা তহা, ৫৬)

৪৩ (সুরা যুখরুফ, ৪৮)

৪৪ (সুরা আরাফ, ১৩২)

৪৫ (সুরা আরাফ, ১২৬)

আমি মরিয়মতনয় ও তার মাতাকে নিদর্শন বানিয়েছি (অলৌকিকভাবে তাকে তার মাতা থেকে জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে)।[৪৬]

১১.

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

অতঃপর আমি নুহ ও কিস্তির আরোহীদেরকে তুফান থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং আমি কিস্তিকে জগদবাসীর জন্য আয়াত তথা নিদর্শন বানিয়েছি।[৪৭]

অলৌকিক ব্যাপার হওয়ার কারণে কিস্তিকে আয়াত বলা হয়েছে।

১২.

فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আমি (আল্লাহ তাআলা) ইবরাহিমকে আগুন থেকে রক্ষা করেছি (অর্থাৎ তিনি আগুনকে হজরত ইবরাহিম আ.-এর জন্য আরামদায়ক ঠান্ডা বানিয়ে দিয়েছেন)। নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য আয়াত তথা নিদর্শন রয়েছে।[৪৮]

১৩.

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজরজনীতে তাঁর প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন।[৪৯]

১৪.

وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢

---

৪৬ (সুরা মুমিনুন, ৫০)

৪৭ (সুরা আনকাবুত, ১৫)

৪৮ (সুরা আনকাবুত, ২৪)

৪৯ (সুরা নাজম, ১৮)

(কাফিররা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া ইত্যাদির মতো) কোনো নিদর্শন দেখলে (শত্রুতা ও বিদ্বেষবশত) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত জাদু।[৫০]

তামবিহ (দৃষ্টি আকর্ষণ)

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবিকে এ পরিমাণ মুজিজা অবশ্যই দান করেছেন, যা উক্ত নবির নবুয়তের সত্যতা সুচারুরূপে প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট এবং তা নবুয়ত ও রিসালাতের অকাট্য দলিল ও মজবুত প্রমাণ হতে পারে। দ্ব্যর্থহীন নিদর্শন, সুস্পষ্ট দলিল ও অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাফিররা মুজিজা প্রকাশ করার দাবি করলে কখনো কখনো তাদেরকে দেখানোর জন্যও মুজিজা প্রকাশ করা হতো। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا

আমি সামুদ সম্প্রদায়কে মুজিজাস্বরূপ দিয়েছিলাম উঁঠনী, কিন্তু তারা এর সাথে অবিচার করেছে।[৫১]

অধিকাংশ সময় কাফিরদের দাবিতে নবিদের থেকে যে মুজিজা প্রকাশ পেত, তারা তা অস্বীকার করে বসত। তাদের মুজিজা প্রকাশ করার দাবি সত্য গ্রহণ করার জন্য ছিল না, বরং শত্রুতা-বিদ্বেষ ও একগুঁয়েমির ওপর ভিত্তি করে তারা মুজিজা প্রকাশ করার দাবি করত। কাফিররা বিশেষ বিশেষ মুজিজার দাবি করে হজরত আম্বিয়া কিরাম আ.-কে অক্ষম ও তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তামাশা করার জন্য করে থাকত।

সুতরাং যে-সমস্ত আয়াতে মুজিজাকে নাকচ ও অস্বীকার করা উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে ওই বিশেষ বিশেষ মুজিজাকে নাকচ করা হয়েছে, যার দাবি করা হয়েছিল শুধু নবিদেরকে অক্ষম ও তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপের মানসে। বিবেকের দৃষ্টিতেও সংগত নয়, যে যখন মুজিজার দাবি করবে তার হৃদতুষ্টিমতো মুজিজা দেখানো হবে।

---

৫০ (সুরা কমার, ২)

৫১ (সুরা বনি ইসরাইল, ৫৯)

নাউজুবিল্লাহ! মুজিজা কি তাহলে কোনো শিশুসুলভ বাজিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল, লোকেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মুজিজা দেখানোর দাবি তুলতে থাকবে আর নবিগণ তা দেখিয়ে যাবেন? সুতরাং আল্লাহ তাআলার পয়গম্বরগণ যদি দ্বীনের অন্য সমস্ত কাজ ফেলে রেখে শুধু মানুষের ইচ্ছামতো মুজিজাই দেখিয়ে থাকেন, তাহলে তা ক্রীড়নকে রূপান্তরিত হবে এতে কোনো সন্দেহে নেই।

নাস্তিকেরা বলে, এই ধরনের আয়াতে মুজিজা নাকচ করার দ্বারা সব ধরনের মুজিজা নাকচ করা উদ্দেশ্য। তবে তাদের এ দাবি একেবারেই ভ্রান্ত ও বাতিল। সার্বিকভাবে মুজিজা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদিস প্রমাণসমেত বিদ্যমান রয়েছে, যা কখনোই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায়, কুরআনে কারিমে যে-সমস্ত আয়াতে বাহ্যিকভাবে মুজিজা সংঘটিত হওয়াকে নাকচ করা হয়েছে, সেখানে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তামাশাচ্ছলে দাবিমূলক মুজিজাকে নাকচ করা উদ্দেশ্য, যা কাফিররা শুধু নবিদেরকে হয়রানি ও অক্ষম করে দেওয়ার মানসে করে থাকত। আর যে অগণিত আয়াতে মুজিজাকে সাব্যস্ত করা উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে বাস্তবিক মুজিজা প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য, যা হজরত আম্বিয়া কিরাম আ.-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য অকাট্য দলিল ও সুদৃঢ় প্রমাণস্বরূপ। এ ছাড়াও দাবি সাব্যস্ত হওয়া ও প্রমাণিত করার জন্য শুধু সঠিক দলিল পেশ করাই যথেষ্ট। দাবিমূলক কোনো দলিল পেশ করা আবশ্যক নয়। কেননা আদালতে দাবি সাব্যস্ত করার জন্য দুজন নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী সাক্ষী পেশ করাই যথেষ্ট হয়ে থাকে। দাবিমূলক কোনো সাক্ষী পেশ করা আবশ্যক হয় না। আম্বিয়াগণ আ.-এর নবুয়ত সাব্যস্ত করার জন্য অসংখ্য অকাট্য দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আম্বিয়া কিরাম দাবিমূলক ও হয়রানিস্বরূপ মুজিজা পেশ করাকে পুরোপুরিরূপে অস্বীকার করে দিয়েছেন। এর সংগত কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কাফিররা মুজিজা দেখার মতো উপযুক্ত মানুষ নও! কেননা তোমাদের থেকে সত্য গ্রহণের আশা উবে গিয়েছে। কখনো উত্তর দেওয়া হয়েছে, ইতিপূর্বেও তোমাদেরকে এ ধরনের মুজিজা দেখানো হয়েছে, এর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে তোমরা বলতে পারো? এর দ্বারা শুধু তোমাদের দাবিমূলক আশাই পূর্ণ হয়েছে, তা ছাড়া আর কী? কাফিররা আম্বিয়া কিরামকে জাদুকর ও ম্যাজিশিয়ান এবং মুজিজাকে জাদু ও ম্যাজিকের মতো ঐচ্ছিক কাজ মনে করার কারণে বিভিন্ন ধরনের মুজিজা প্রকাশ করার দাবি জানাত। তাদের এ ধারণা অমূলক ধারণা বলে খণ্ডন করার জন্য উত্তরস্বরূপ তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়,

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

কোনো নবির জন্য সম্ভব নয় সে আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত কোনো মুজিজা দেখাতে সক্ষম হবেন।[৫২]

অর্থাৎ মুজিজা আল্লাহ তাআলার কাজ, নবিদের কাজ নয়। আল্লাহর পানাহ! মুজিজা জাদু ও ম্যাজিকের মতো কোনো বিদ্যা নয় যে, নবিগণ তা স্বেচ্ছায় যখন যে দাবি করবে দেখাতে পারবেন। মুজিজা আল্লাহ তাআলার কাজ। আর আল্লাহ তাআলা একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক, প্রজ্ঞাবান ও সর্বোজ্ঞ। কাজেই মুজিজা প্রকাশিত হওয়া তাঁর ইচ্ছাধীন, তা প্রকাশ পাওয়া উপযুক্ত বলে বিবেচ্য ও কল্যাণকর হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। এতে কারও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বা মত-অভিমতের কোনো মূল্য নেই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

আর আপনি তো শুধু ভীতিপ্রদর্শন করবেন। এবং প্রত্যেক কওমের জন্য রয়েছে পথপ্রদর্শক।[৫৩]

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

হে নবি আপনি বলুন! আমি আমার রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি আর আমি তো শুধু একজন মানুষ ও রাসুল।[৫৪]

এ আয়াতের উদ্দেশ্য, আমি একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী রাসুল তথা দূত মাত্র। তোমাদের দাবি ও ইচ্ছামতো মুজিজা প্রকাশ করা আমার সাধ্যে নেই। কেননা আমিও তোমাদের মতো আল্লাহ তাআলার বান্দা ও একজন মানুষ। মানবীয় সব গুণাগুণ আমার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। আর মুজিজা মানবীয় শক্তিসামর্থ্য ও সাধ্যের বাইরের বস্তু। অথবা উক্ত আয়াতগুলোর অর্থ, নবিদের কাজ ভীতিপ্রদর্শন করা ও মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছে দেওয়া, বাদবাকি অন্তর চিরে কারও মধ্যে হিদায়াত প্রবেশ করানো নবিদের কাজ নয় বরং তা আল্লাহ তাআলার কাজ। কিন্তু

---

৫২ (সুরা রাদ, ৩৮)

৫৩ (সুরা রাদ, ৭)

৫৪ (সুরা বনি ইসরাইল, ৯৩)

মুলহিদ ও নাস্তিকরা এ আয়াতের উদ্দেশ্য নিয়েছে, আমি একজন নবি ও ভীতিপ্রদর্শক। আর নবি ও ভীতিপ্রদর্শককে কোনো মুজিজাই দান করা হয় না। দান না করাও উচিত বরং মুজিজা প্রকাশিত হওয়া নবুয়ত ও রিসালাতের শান-পরিপন্থী। সুবহানাল্লাহ, কী আজিব তাদের বোধবুদ্ধি! (আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট ভ্রান্ত বোধবুদ্ধি থেকে আশ্রয় কামনা করছি।) এ আয়াতগুলোর মূল অর্থ ও সঠিক উদ্দেশ্য এবং বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা তাই যা আমরা পেশ করেছি। এরপরেও যদি মেনে নেওয়া হয় উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা মুজিজাকে নাকচ করা হয়েছে, তাহলে এর দ্বারা শুধু ওই বিশেষ বিশেষ মুজিজা উদ্দেশ্য হবে, যা কাফিররা নবিদের নিকটে দাবিমূলক ও হয়রানিস্বরূপ প্রকাশ করার জোর তাকিদ করত, যা শানে রিসালাতের সাথে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যশীল নয়। কাজেই এর দ্বারা সার্বিকভাবে মুজিজাই শানে রিসালাতের পরিপন্থী হওয়া বোঝায় না।

রিসালাতের দাবি ও মুজিজার মাঝে সম্পর্ক

আমাদের ওপরের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, মুজিজা নবুয়ত ও রিসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও অকাট্য দলিল। মুজিজা নবুয়ত ও রিসালাতের সাথে তেমনই সম্পর্কে জোড়া, যেমন রাষ্ট্রীয় নিদর্শনাবলি ও বৈশিষ্ট্য মন্ত্রিত্বের পদমর্যাদা এবং রাজকীয় মোহর দূতালির দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা স্যার সাইয়েদ আহমদ এবং আল্লামা শিবলি রহ. উভয়ের ধারণারও খণ্ডন হয়ে গিয়েছে। কেননা তাদের ধারণামতে মুজিজা রাসুলের রিসালাত প্রমাণ করে না এবং অলৌকিক ঘটনাবলির সাথে রিসালাত ও নবুয়তের কোনো সম্পর্ক নেই।[৫৫]

আল্লামা শিবলি নুমানি রহ.-এর নিকট মুজিজা নবুয়তের দলিল নয়। কিন্তু যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য সর্বাবস্থায় দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন হয়, এ কারণে আল্লামা শিবলি ও তার অনুরূপ ধারণা পোষণকারীগণ অন্য বস্তুকে নবুয়তের দলিল হওয়ার মত পেশ করেছেন। তাদের মতে আম্বিয়া কিরাম আ.-দের শিক্ষাদীক্ষা, পথপ্রদর্শন এবং তাদের চারিত্রিক মাধুরী ও ভাষাই হলো নবুয়তের মূল ও প্রকৃত দলিল। আর কর্মগত মুজিজা কোনো বিষয়ই না, বরং শুধু জ্ঞানগত ও তাত্ত্বিক বিষয়ই নবুয়তের দলিল। আল্লামা শিবলি রহ.-এর মত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আম্বিয়া কিরামকে যেন

---

৫৫ আল্লামা শিবলি নুমানি, *দাহিউল কালাম*, ৫২।

শুধু আলিম ও তাত্ত্বিক বোধসম্পন্ন লোকদের নিকটেই প্রেরণ করা হয়েছে, যারা নবিদের শিক্ষাদীক্ষার চমৎকারিত্ব খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে। জনসাধারণের জন্য নবি-রাসুল প্রেরিত হওয়া সংগত নয়, কারণ তারা জ্ঞানবিজ্ঞান, তথ্য-উপাত্ত ও তাত্ত্বিকতার কী বোঝে।

নিঃসন্দেহে নবিদের শিক্ষাদীক্ষা, হিদায়াত এবং তাদের উত্তম চরিত্রাবলি নবুয়তের সত্যতার দলিল বহন করে এবং এ গুণগুলো নবুয়তের দলিলও বটে, কারণ এগুলোও অলৌকিক গুণাগুণ ও মুজিজা। কেননা নবিদের অনুরূপ এমন শিক্ষাদীক্ষা হিদায়াত ও পথপ্রদর্শন এবং উত্তম চরিত্রাবলি পেশ করতে সমস্ত পৃথিবী অক্ষম। যে-সমস্ত কুরআনের আয়াত ও মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদিসগুলো দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে কর্মগত মুজিজা প্রমাণিত হয়, এসবের সবগুলোই আল্লামা শিবলি রহ.-এর নিকট অগ্রহণযোগ্য বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

উপরিউক্ত ধারণা পোষণকারীদের নিকট একটি প্রশ্ন

যে-সমস্ত লোক কর্মগত মুজিজাকে নবুয়তের দলিল মনে করে না, তাদের নিকট আমাদের একটি প্রশ্ন, (উদাহরণস্বরূপ) হজরত মুসা আ.-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত ও হাত আলোকিত হওয়া, হজরত ইবরাহিম আ.-এর জন্য নমরুদের প্রজ্জ্বলিত আগুন আরামদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, হজরত দাউদ আ.-এর জন্য লোহা মোমের মতো গলে যাওয়া এবং হজরত সুলাইমান আ.-এর জন্য বাতাস আজ্ঞাবহ হুকুমের দাস হয়ে যাওয়া ও হজরত ঈসা আ.-এর ফুৎকারে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যাওয়া এবং কুষ্ঠরোগী সুস্থ ও জন্মান্ধ দৃষ্টি ফিরে পাওয়া আর আমাদের নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙুল মুবারক থেকে ঝরনা নির্গত হওয়া এবং আঙুলের এক ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, মরা কাষ্ঠখণ্ডের কান্না করা ইত্যাদি ইত্যাদি মুজিজার ব্যাপারে তাদের মতামত কী? অথচ এ ধরনের মুজিজা হজরত আম্বিয়া কিরামের থেকে প্রকাশিত হওয়ার দলিল খোদ কুরআনে কারিম এবং মুতাওয়াতির হাদিস। এগুলো অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে, যা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন

এ ধরনের মুজিজা হজরত আম্বিয়া কিরাম আ. থেকে কেন প্রকাশিত হয়েছিল? কোনো অনর্থক কাজ অথবা ক্রীড়াকৌতুকের জন্য নাকি কোনো হিকমত অথবা অল্যাণ বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল?

প্রথমটি তো কখনোই হতে পারে না এবং তা বাতিল হওয়াও সুস্পষ্ট। কারণ হজরত আম্বিয়া আ. অনর্থক কাজ ও অপ্রয়োজীয় কথাবার্তা, ক্রীড়াকৌতুক, ম্যাজিক এ ধরনের কাজ থেকে মুক্ত ও পূত-পবিত্র। নবিদের জন্য কখনোই বাজে কথা ও অর্থহীন কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আবশ্যকীয়ভাবে দ্বিতীয় কথাটিই মান্য করতে হবে। অর্থাৎ এ সমস্ত মুজিজাগুলো প্রকাশিত হওয়ার পেছনে উল্লেখযোগ্য কোনো কারণ ছিল। অথবা কল্যাণকর ফলপ্রসূ কোনো অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন যে হজরতগণ মুজিজাকে নবুয়তের দলিল মান্য করেন না তারা বলুন! এ কর্মগত মুজিজার এগুলো ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য ছিল যে এ অলৌকিক কার্যাবলিই নবিদের সত্যতার দলিল হলো? মানুষেরা এ সমস্ত মুজিজাকে তাদের নবুয়তের দলিল ও প্রমাণ বলে জ্ঞান করল? হজরত মুসা আ.-এর ব্যাপারে কুরআনে নাজিল হয়েছে,

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ

> এ দুটি মুজিজা তোমার নবুয়ত ও রিসালাতের দলিলস্বরূপ। যা তোমাকে মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে।[৫৬]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মুজিজা নবুয়তের শক্তিশালী দলিল ও অকাট্য প্রমাণ।

একটি সংশয়ের অপনোদন

যারা মুজিজাকে নবুয়তের দলিল হওয়ার স্বীকৃত দেন না, তারা সন্দেহমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, মুজিজা নবুয়তের দলিল হলে যে-সমস্ত লোকেরা জাদুবিদ্যা, ম্যাজিক, নজরবন্দী ও ভেলকিবাজি ইত্যাদির মাধ্যমে আশ্চর্যজনক বিষয়াবলির

---

৫৬ (সুরা কাসাস, ৩২)

অবতারণা করে, তাহলে তো তাদেরকেও নবি বলা উচিত? কাজেই মুজিজা দ্বারা নবুয়ত সাব্যস্ত করা হলে নবি ও ভণ্ড নবি তথা ম্যাজিশিয়ানের মাঝে সাদৃশ্য ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়।

উত্তর

যৎসামান্য সন্দেহের নাম লেগে যাওয়ার কারণে কোনো বস্তুকে মূল্যহীন জ্ঞান করা এবং পুরোপুরি অস্বীকার করা বিবেকবানদের কাজ নয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু রয়েছে, যাতে সামান্য পরিমাণও সাদৃশ্য ও সংশয় নেই? শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের নিকটেই সৈন্যসামন্ত ও ধনভান্ডার থাকে না। বরং কখনো কখনো রাষ্ট্রদ্রোহীদের নিকটও এসবের সবকিছুই বিদ্যমান থাকে এবং কখনো তারা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে যুদ্ধ ও লড়াইও করে থাকে। কখনো তাদের মাথায় বিজয়ের মুকুটও দেখা যায়। তাই বলে কি বাহ্যিক এ সাদৃশ্য ও সাময়িক পরাজয়ের কারণে সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তির নিকট পুরোপুরি রাজত্বকেই অস্বীকার করা সঠিক সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে? বাহ্যিকভাবে রাজা ও রাষ্ট্রদ্রোহী উভয়ের নিকট একই আসবাবপত্র থাকার কারণে অকপটে আমরা রাজা, রাজ্য ও রাজত্বকে মান্য করি না বলে স্লোগান দেওয়া সঠিক বলে বিবেচ্য হবে? হাতুড়ে আনাড়ি ডাক্তারও কখনো অভিজ্ঞ পারদর্শী চিকিৎসকের চেয়ে চিকিৎসায় অগ্রগামী হয়ে থাকে, তাই বলে কি কোনো সুস্থ বিবেকবানের জন্য এতটুকু সাদৃশ্য থাকার কারণে পুরো চিকিৎসাবিদ্যাকেই অস্বীকার করা উচিত হবে? এ সাদৃশ্যের কারণে চিকিৎসাকে অকেজো মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আদালতে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের উকিলই যুক্তিতর্ক করে নিজেদের দলিল পেশ করে। কখনো যুক্তিতর্কে বাতিল পক্ষের উকিল বাজিমাত করে দেয়, তাই বলে কি কোনো বুদ্ধিমানের নিকট এই বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে পুরো দলিলকেই অস্বীকার করে এ কথা বলা, 'দলিল কোনোকিছুই না,' বিবেকের দৃষ্টিতে সঠিক বলে গণ্য হবে?

বাজারে ভেজাল-নির্ভেজাল সব রকমের সরঞ্জাম বেচাকেনা করা হয়। কিন্তু নির্ভেজালের সাথে ভেজালের সাদৃশ্য থাকার কারণে কেউ ক্রয়-বিক্রয়কে ছেড়ে দেয়নি এবং ব্যবসাবাণিজ্যও বন্ধ রাখেনি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, দুই বস্তুতে পরস্পরে সামান্য সাদৃশ্য থাকার কারণে পুরো বস্তুকেই অস্বীকার করা বিবেকবানদের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। বরং হক-বাতিল, কৃত্রিম-অকৃত্রিম এবং ভেজাল-নির্ভেজালের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। এমনইভাবে মুজিজা ও ম্যাজিকের মাঝে পার্থক্য

নির্ণয় করতে হবে। সামান্য সাদৃশ্যের কারণে মুজিজাকে ম্যাজিকের মতো অনর্থক ও নিষ্কর্মা মনে করা উচিত নয়। কারণ মুজিজার ওপরেই নবুয়তের সত্যতা ও সঠিক প্রমাণিত হওয়ার মানদণ্ড নির্ভর করে। কেননা নবুয়তই হলো ইহকালীন জগতের সুখশান্তি ও পরকালের সফলতা জানার একমাত্র মাধ্যম। তাই বাছবিচার ও পরীক্ষানিরীক্ষা করে হক-বাতিল তথা জাদু ও মুজিজার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করাও আবশ্যক।

যদি ভেজাল-নির্ভেজালের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয়ই ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা অকেজো হয়ে পড়বে। এভাবেই কেউ যদি ম্যাজিক, জাদুবিদ্যা আর মুজিজার মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে নবুয়তকেই প্রত্যাখ্যান করে বসে, তাহলে তার আখিরাতের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। পরকালীন জগতের জন্য সফলতা অর্জন করা ও কিচ্ছুটি লাভ করা তার সম্ভব হবে না। সামান্য সাদৃশ্যের জন্য যখন মানুষ নশ্বর পৃথিবীর সামান্য উপকারকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়, তাহলে সামান্য সাদৃশ্যের কারণে আত্মিক জগতের অবিনশ্বর উপকার অর্জন করার সোপান ও চিরস্থায়ী ব্যর্থতা থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ পাওয়ার মাধ্যম নবুয়ত ও আখিরাতকে কীভাবে তরক করতে পারে।

মুজিজার প্রামাণ্যতা

আলহামদুলিল্লাহ, ওপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে মুজিজা সংঘটিত হওয়া সম্ভব বিষয়, অসম্ভব নয়। কিন্তু কোনো বস্তু শুধু সম্ভব হওয়া প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ভিন্ন দলিলের প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞাতব্য, পৃথিবীর কোনো ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যম, সাক্ষ্য ও বর্ণনা ছাড়া ভিন্নতর আর কোনো উপায় নেই। মানুষ ব্যক্ত করে থাকে, এই ঘটনা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। আর অদেখা ঘটনাকে সাক্ষ্যের মাধ্যমে বর্ণনা দিয়ে থাকে। মানুষ প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকে কোনো মাধ্যম অথবা মাধ্যম ছাড়া যে খবর বা সংবাদ শ্রবণ করে থাকে, তার নাম রেওয়ায়েত বা বর্ণনা। বিবেকের মানদণ্ডে রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হওয়ার জন্য এর মধ্যকার মধ্যস্থতা তথা রাবি ও বর্ণনাকারীগণ সত্যবাদী, গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া শর্ত। সকল আদালতে বিচারব্যবস্থাপনার ফয়সালা ও ঘটনার সত্যতার তদারকির জন্য সাক্ষ্য-ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হিসেবে গণ্য। কাজেই সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক ও

বুদ্ধিমান হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য গণ্য হবে। এমন ধারায় উল্লেখিত সংবাদকে অস্বীকার করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়।

সাক্ষ্য প্রদানকারীদের সদস্যের মাঝে কারও সত্যবাদিতা, সততা ও দ্বীনদারি নিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত সাক্ষ্য আদালতের দৃষ্টিতে ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু যদি সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তিগণ এমন হয়ে থাকেন, যাদের বুঝ, স্মরণশক্তি, দ্বীনদারি ও সততার ওপর আঙুল তোলারও অবকাশ নেই, তাহলে এমন ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে না করা নিঃসন্দেহে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বস্তুত যখন তাদের থেকে বর্ণিত ঘটনাবলি মুতাওয়াতির তথা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত হয়, তখন তা মেনে নেওয়া বিবেকের জন্য অবশ্যকর্তব্য এবং তা অমান্য করা বিবেকের মানদণ্ডে হারাম ও অবৈধের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলে কোনো ঘটনা অবগত হওয়ার মাধ্যম রেওয়ায়েত তথা বর্ণনা। সুতরাং ঘটনা বর্ণনাকারীদের মধ্যে যদি সত্যবাদিতা এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার সমস্ত মানদণ্ড পুরোপুরিরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাদের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হবে। বর্ণনার সত্যতা যাচাই-বাছাইয়ের যে নিয়মনীতিকে হাদিস বিশারদগণ মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাস এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম। বিবেকের দৃষ্টিতে এর থেকে বড় কোনো মানদণ্ডও আর হতে পারে না। হাদিসের মূলনীতিকে সহিহ থেকে গায়রে সহিহ, গ্রহণযোগ্য থেকে অগ্রহণযোগ্য সংবাদকে আলাদা করার জন্যই রচনা করা হয়েছে। শুদ্ধ-অশুদ্ধ ও সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার উদ্দেশ্যেই হাদিসের মূলনীতিকে প্রণয়ন করা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু মুজিজা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তবে তাঁর অধিকাংশ মুজিজাই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অল্পসংখ্যক মুজিজা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এতে তো সন্দেহ ও সংশয়ের লেশমাত্রও হতে পারে না। আর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মুজিজার অধিকাংশই মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত হওয়ার কারণে এতেও সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে কিছুসংখ্যক মুজিজা খবরে ওয়াহিদ দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত বিবেকবান ব্যক্তির সর্বসম্মতিক্রমে খবরে ওয়াহিদ বা এককভাবে বর্ণিত সংবাদের সংবাদদাতার বুঝ, স্মৃতিশক্তি এবং সত্যবাদিতা নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হলে তার দেওয়া সংবাদ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়। এমন ব্যক্তির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত

বিষয়ের ওপর আমল করা ওয়াজিব ও আবশ্যক হয়ে যায়। শুধু ধারণার পিঠে আরোহণ করে কল্পনাজল্পনা করা, হতে পারে এ বর্ণনাকারী উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝতে ভুল করেছে অথবা তিনি ভুল বুঝেছেন বা কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য বানিয়ে মিথ্যা বলছেন ইত্যাদি ধরনের মস্তিস্কপ্রসূত ধ্যানধারণা দ্বারা এ প্রকারের খবর ও সংবাদকে প্রত্যাখ্যান করা জায়েজ নেই। কোনো সংবাদ নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার জন্য যদি এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের শর্ত লাগানো হয় যে, তা থেকে কোনোরকম বুদ্ধিবৃত্তিক সংশয়-সন্দেহ বের করা যাবে না, তাহলে দুনিয়ার সংবাদ-ব্যবস্থাপনা ধসে পড়বে এবং এদিকে দৃষ্টি দিলে তখন চিঠি, টেলিগ্রাম ও তারবার্তার সংবাদও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। বরং আল্লাহর পয়গামের ওপর থেকেও গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিশ্বাস ও নির্ভরতা উবে যাবে। কেননা এতেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, কারণ লেখকের ভুল হতে পারে অথবা সংবাদদাতা ভুল খবর প্রচার করতে পারে। কারণ মানুষের থেকে ভুল হওয়া অবাস্তব কিছু নয়।

সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিক সন্দেহ ও ধারণানির্ভর কল্পনাজল্পনা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি পার্থিব জগতের কাজকর্মে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করা আবশ্যক ও অতীব প্রয়োজনীয় মনে হয়, তাহলে মুজিজার ব্যাপারে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করার সময় তারা এপাশ-ওপাশ করতে থাকে কেন? অথচ হাদিস যাচাই-বাছাইয়ের মানদণ্ড দুনিয়ার খবরাখবরের সত্যাসত্য যাচাই-বাছাইয়ের মানদণ্ড থেকে হাজার-লক্ষ গুণ উর্ধ্বের। তা এত উঁচুমানের যে পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি এর আশপাশেও ভিড়তে পারবে না। দুনিয়ার কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনার সাধ্য নেই হাদিসের বর্ণনার সাথে টক্কর দেওয়ার কথা কল্পনা করতে পারে। ইতিহাসসংক্রান্ত ঘটনাবলির গ্রহণযোগ্য থেকে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থে ঐতিহাসিকগণ কোনো একটি ঘটনাকেও সনদসমেত উল্লেখ করেননি। কিন্তু হাদিস বিশারদগণের আমল পুরোপুরিই এর ব্যতিক্রম। তাদের নিকট সনদ ব্যতীত কোনো রেওয়ায়েত, ঘটনা বা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু সনদও যথেষ্ট নয়, বরং যতক্ষণ না সনদের শুরু থেকে শেষ অবধি রাবিদেরকে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

নববি মুজিজাসমূহ

নববি মুজিজার কিছু মুজিজা তো কুরআনে কারিমে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে আর অধিকাংশই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত হয়েছে। সহিহ হাদিসে বিস্তারিতভাবে মুজিজাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে কারিমের যে-সমস্ত জায়গায় নবুয়ত সাব্যস্ত করার ধারাবাহিকতায় আয়াত (آيَة) শব্দটি একবচন অথবা

বহুবচনরূপে বা বুরহান (برهان) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সে সবখানে মুফাসসিরদের ঐকমত্যে মুজিজা উদ্দেশ্য হবে।

১.

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

এবং যখন তারা কোনো মুজিজা দেখত বিদ্রুপমূলক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। এবং বলত, এ তো দেখছি সুস্পষ্ট জাদু।[৫৭]

২.

فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ

আর মুসা যখন আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে তাদের কাছে আগমন করল, তারা তখন তা নিয়ে হাসিতে মেতে উঠল।[৫৮]

৩.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

নিশ্চয় আমি মুসাকে ফিরআউন, হামান ও কারুনের কাছে আমার নিদর্শনাবলি ও সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রেরণ করেছি, অতঃপর তারা তাকে বলে বসল, এ তো জাদুকর ও চির মিথ্যাবাদী।[৫৯]

কুরআনের আয়াতগুলোতে যেখানে আয়াত শব্দটি একবচন ও বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে মুজিজা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে অনেক জায়গায় আবার নিদর্শন ও কুরআনের আয়াত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যে স্থানে

---

৫৭ (সুরা সাফফাত, ১৪-১৫)

৫৮ (সুরা যুখরুফ, ৪৭)

৫৯ (সুরা মুমিন, ২৩-২৪)

আম্বিয়া কিরামের নবুয়ত প্রমাণিত করার জন্য আয়াত শব্দটি একবচন ও বহুবচন হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, এ সমস্ত জায়গাতে মুজিজা অর্থ উদ্দেশ্য হবে।

কুরআনি মুজিজা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিজা কুরআনে কারিমে সুস্পষ্টরূপে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। আর যে মুজিজাগুলো সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হাদিসের গ্রন্থ ও সিয়ার তথা যুদ্ধদলবিষয়ক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। মুজিজা নিয়ে উলামায়ে কিরাম স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। নিম্নে কুরআনে উল্লেখিত কিছু মুজিজার আলোচনা পেশ করা হলো।

১.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন।[৬০]

২.

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ

কিয়ামত সমাগত হয়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।[৬১]

৩.

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴿١﴾

আপনি নিক্ষেপ করেননি, যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন বরং আল্লাহ তাআলা নিক্ষেপ করেছেন।[৬২]

---

৬০ (সুরা বনি ইসরাইল, ১)

৬১ (সুরা কমার, ১)

৬২ (সুরা আনফাল, ১৭)

৪.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴿٥٥﴾

তোমাদের মধ্য হতে যারা ইমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে অঙ্গীকার করছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে জমিনে রাজত্ব দান করবেন, যেমন তিনি রাজত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।[৬৩]

৫.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

ওই সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াতসমেত ও সত্য দ্বীন দিয়ে, যাতে করে তা সকল দ্বীনের ওপর বিজয় লাভ করে, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।[৬৪]

এই বিষয়বস্তুটিই সুরা ফাতাহের ২৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

একই অর্থ, শুধু 'আল্লাহ তাআলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট' এতটুকু অতিরিক্ত। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতদ্বয়ে দ্বীনে মুহাম্মাদিকে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করার ওয়াদা করছেন, আলহামদুলিল্লাহ, এ ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে।

৬.

---

৬৩ (সুরা নুর, ৫৫)

৬৪ (সুরা সাফ, ৯)

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার থেকে বাইআত গ্রহণ করেছে। আর তিনি জেনে নিয়েছেন তাদের অন্তরের খবর। এবং তিনি তাদের ওপর নাজিল করেছেন প্রশান্তি। এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও অধিক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লব্ধ প্রচুর সম্পদের, যার মালিক হবে তোমরা। অতঃপর তিনি তোমাদের জন্য তা ত্বরান্বিত করলেন। এবং মানুষদের হাতকে তোমাদের থেকে বিরত রাখলেন, যাতে করে মুমিনদের জন্য তা নিদর্শন হয়। এবং তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এবং অন্য আরেকটি বিজয় যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তাআলা তা পরিবেষ্টন করে নিয়েছেন আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে সক্ষম।[৬৫]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা খাইবার বিজয় ও অন্যান্য ওয়াদা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি তা পূর্ণ করেছেন।

৭.

لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ

---

৬৫ (সুরা ফাতাহ, ১৮-২১)

تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

আল্লাহ চান তোমরা নিরাপদে ও নির্ভয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তোমাদের মাথাগুলোকে মুণ্ডিয়ে ও চুলগুলোকে খাটো করে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জানো না। এবং তিনি তোমাদের জন্য সেটি ছাড়াও আসন্ন বিজয় নিশ্চিত করেছেন। তিনিই তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে সকল দ্বীনের উপর সেটিকে বিজয়ী করার জন্য। আর (এ ব্যাপারে) সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[৬৬]

এ আয়াতে মসজিদে হারামে প্রবেশ করার যে ভবিষ্যদবাণী করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, তা পূর্ণ হয়েছে।

৮.

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ

হে নবি! যারা কুফরি করেছে তাদেরকে বলুন! তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে।[৬৭]

এ আয়াতে মক্কা বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

৯.

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।[৬৮]

---

৬৬ (সুরা ফাতাহ, ২৭-২৮)

৬৭ (সুরা আলে ইমরান, ১২)

৬৮ (সুরা কমার, ৪৪-৪৫)

এ আয়াতে বদরের যুদ্ধে বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটিও পূর্ণ হয়েছে।

১০.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

এবং স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। তখন তোমরা কামনা করছিলে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক আর আল্লাহ তাআলা তাঁর কালিমা দ্বারা হককে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কাফিরদের মূলোৎপাটন করতে চাচ্ছিলেন।[৬৯]

এ আয়াতে বদর যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটিও পুরা হয়েছে।

১১.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমরা কি ধরে নিয়েছ যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসবে না? অর্থসংকট ও দুঃখদুর্দশা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল। এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল, এমনকি রাসুল ও তার সাথে ইমান আনয়নকারীগণ বলছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? শুনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য অতি সন্নিকটে।[৭০]

এ আয়াতটি গাজওয়ায়ে আহজাবের দিকে ইঙ্গিত করে। এ যুদ্ধের বিজয় অন্য একটি আয়াতে সুস্পষ্টরূপে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

---

৬৯ (সুরা আনফাল, ৭)

৭০ (সুরা বাকারা, ২১৪)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।[৭১]

১২.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। আপনি তখন মানুষদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের প্রশংসাসমেত পবিত্রতা বর্ণনা করুন। এবং তাঁর কাছে ক্ষমা পার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অধিক তাওবা কবুলকারী।[৭২]

উক্ত আয়াতগুলোতে ফাতহে মক্কার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৩.

الم ① غُلِبَتِ الرُّومُ ② فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ③ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ④ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑤ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑥

আলিফ-লাম-মিম, রোমকরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং তারা এরপর অচিরেই বিজয় লাভ করবে, কয়েক বছরের মধ্যে। পূর্বাপরের ফয়সালা আল্লাহ তাআলারই। আর সেই দিন মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে।

---

৭১ (সুরা আহযাব, ২২)

৭২ (সুরা নাসর, ১-৩)

আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আর আল্লাহ তাআলা তার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা জানে না।[৭৩]

এ আয়াতগুলোয় পারস্যের সাথে রোমকদের যুদ্ধজয়ের ভবিষ্যদবাণী করা হয়েছে। এটাও সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৪.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।[৭৪]

এ আয়াতের অর্থ হলো,

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।[৭৫]

এ আয়াতে কুরআনে কারিমের হেফাজতের অঙ্গীকার করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটাও পূর্ণ হয়েছে।

১৫.

إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

নিশ্চয় যিনি আপনার ওপর কুরআন নাজিল করেছেন, অবশ্যই তিনি আপনাকে আপনার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।[৭৬]

এ আয়াতে ফাতহে মক্কার দিকে ইশারা করা হয়েছে।

---

৭৩ (সুরা রুম, ১-৬)

৭৪ (সুরা হিজর, ৯)

৭৫ (সুরা হা-মিম সাজদা, ৪২)

৭৬ (সুরা কাসাস, ৮৫)

১৬.

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

বলে দিন, যদি আখিরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে, অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ওইসব গোনাহের কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ গোনাহগারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।[৭৭]

এ আয়াতে ইহুদিদের ব্যাপারে ভবিষ্যদবাণী করা হয়েছে। এটাও পূর্ণ হয়েছে।

১৭.

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

তাদের ওপর দরিদ্রতা ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তারা আল্লাহর ক্রোধে পরিণত হয়েছে।[৭৮]

এ আয়াতের অর্থ হলো,

لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴿١١٢﴾

তারা তোমাদেরকে শুধু কষ্ট দেওয়া ব্যতিরেকে আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। তারা যেখানেই থাক না

৭৭ (সুরা বাকারা, ৯৪-৯৫)

৭৮ (সুরা বাকারা, ৬১)

কেন তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি না তারা আল্লাহর থেকে এবং মানুষের থেকে অঙ্গীকার নেয়। এবং তারা আল্লাহর গজবে পরিণত হয়েছে এবং তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা।[৭৯]

এ সমস্ত আয়াতে যে-সকল বিষয়াবলির সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে সবকিছুই পূর্ণ হয়েছে।

১৮.

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেবো এ কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছে, যে বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।[৮০]

অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে এ ভয় প্রকাশিত হয়েছে, এমনকি কাফিররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

এ আয়াতগুলোয় আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, কাফিরদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করে দেবেন। এ ওয়াদাও পুরা হয়েছে, যার প্রমাণ অসংখ্য যুদ্ধে কাফিরদের অধিক সৈন্য থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের স্বল্প সৈন্যের হাতে তারা পরাজিত হয়েছে।

১৯.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু ও এক সৈন্যদল, যা তোমরা

---

৭৯ (সুরা আলে ইমরান, ১১১-১১২)

৮০ (সুরা আলে ইমরান, ১৫১)

দেখোনি। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তাআলা তা ভালো করেই দেখেন।[৮১]

এ আয়াতে আহজাবের যুদ্ধে বিজয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

২০.

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বলুন, যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।[৮২]

এ আয়াতে কুরআনের ব্যাপারে ভবিষ্যদবাণী করা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত কেউ কুরআনের অনুরূপ দৃষ্টান্ত আনতে পারবে না।

মুজিজাবিরোধীদের উপেক্ষণ ও আমাদের উত্তর

এখন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং যাতে বিশ্বাস করা ইমানের অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু প্রসিদ্ধ মুজিজা নিয়ে আলোচনা করব। এর সাথে সাথে আমরা নাস্তিকদের সন্দেহ-সংশয় নিরসনে হকপন্থী আলিমদের প্রদত্ত উত্তরগুলো পেশ করব, যাতে করে হিদায়াত তালাশকারীদের জন্য সঠিক পথ সুগম হয়।

মিরাজবিরোধীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

মিরাজের ঘটনা নিয়ে সংশয়বাদীদের দুটি দল রয়েছে, তার মধ্যে একদল ইসলামের গণ্ডির বাইরে। এ দল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও নবুয়তেরও স্বীকৃতি দেয় না।

---

৮১ (সুরা আহযাব, ৯)

৮২ (সুরা বনি ইসরাইল, ৮৮)

দ্বিতীয় দলটি নিজেদেরকে ইসলামি ঘরানার বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু মিরাজের ঘটনাকে নিজেদের মনমতো করে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করে। তাদের চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী মিরাজের ঘটনাকে বিবেকের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে কখনো বলে, মিরাজের ঘটনা শুধু একটি স্বপ্ন ছিল। আবার কখনো বলে, মিরাজ আত্মিকভাবে হয়েছিল, সশরীরে নয়। বিভিন্ন রকমারি কথার জালে ফাঁসিয়ে হরেক রকম বক্তব্যের ধাঁধায় ফেলে সাধারণ মানুষকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের গহিন কূপে নিক্ষিপ্ত করে তারা নিজেরা সরে পড়ে। এটা সুস্পষ্ট রহস্যে ঘেরা মুনাফেকি চরিত্রের স্বভাব। সর্বাগ্রে আমরা প্রথম দলের বিভিন্ন সংশয় বর্ণনা করে পাঠকের সামনে তাদের প্রশ্নমালার সমুচিত জবাব পেশ করব।

প্রথম সংশয়

আসমানের কোনো অস্তিত্বই নেই। এটি শুধু চোখের দৃষ্টিসীমার নাম। তাহলে আকাশভ্রমণ করার প্রশ্ন কোত্থেকে আসবে?

উত্তর

আসমানের অস্তিত্বের বিষয়টি সর্বস্বীকৃত বিষয় হিসেবে সমস্ত আম্বিয়া কিরামের শরিয়তে সর্বসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। হাজার বছর ধরে গবেষক ও দার্শনিকেরা স্বীকার করে আসছে, আসমান বিদ্যমান ও শরীরবিশিষ্ট একটি বস্তু। আসমান কোনো দৃষ্টিসীমার নাম নয়। হাল আমলের কিছু আনকোরা দার্শনিক ও সায়েন্টিস্ট আসমানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে বটে, কিন্তু তাদের নিকট আসমান দৃষ্টিগোচর হয় না এ ছাড়া অস্বীকৃতির আর কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ নেই। তারা বলে, আসমানের অস্তিত্ব বলে কিছু থাকলে নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হতো। যদি খালি চোখে নাও দেখতে পেতাম, অবশ্যই দুরবিন ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা অন্তত আমাদের চোখে পড়ত। প্রকৃত জ্ঞানীরা মাত্রই বুঝে থাকবেন, কোনোকিছু দৃষ্টিগোচর না হওয়া ও যন্ত্রাদি দ্বারা চোখে না পড়া উক্ত বস্তুর অস্তিত্বহীনতার দলিল হতে পারে না। এখনো হাজার হাজার বস্তু ভূতলে ও সমুদ্রের তলদেশে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনোভাবেই দৃষ্টিগোচর হয় না, কাজেই সেগুলোকেও তাদের অস্বীকার করা উচিত?

আলোকিত কোনো বাতির ওপর নির্মল স্বচ্ছ কাচের আবরণ দিয়ে ঢেকে দিলে দূর থেকে শুধু বাতিটিই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, আবরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চোখে পড়ে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কোনো বস্তু দৃষ্টির আড়ালে থাকলেই তা অবিদ্যমান হওয়ার দলিল বহন করে না। কোনো বস্তু দৃষ্টিসীমা থেকে এত দূরে থাকা বিচিত্র কিছু নয়, সেখানে মানুষের দৃষ্টিশক্তি পৌঁছাতে পারে না এবং কোনো যন্ত্রাদির সাহায্যে সেখানে দৃষ্টি পৌঁছানোও সম্ভবপর হয় না। কাজেই কোনো বস্তু এ পরিমাণ দূরে থাকলে তা দৃষ্টিগোচর না হওয়ারই কথা। তেমনই আসমানও দৃষ্টিশক্তির বাইরে অবস্থিত, যেখানে কোনো চোখ পৌঁছাতে পারে না এবং কোনো যন্ত্রশক্তি সেখানে কাজ করে না। কারণ আসমান ভূপৃষ্ঠ থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আসমান যদিও নির্মল ও স্বচ্ছ, তবে তা চাঁদ-সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল কোনো গ্রহ নয়। তাই চন্দ্র-সূর্য লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। কাজেই কোনো বস্তু দৃষ্টিসীমার বাইরে হলেই তা বিদ্যমান নয় ও অস্তিত্বহীন জ্ঞান করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। এতৎসত্ত্বেও এ বিষয়টি নিয়ে দার্শনিকদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হাতে-গোনা কিছুসংখ্যক দার্শনিক ছাড়া সমস্ত দার্শনিক ও গবেষকের মতে, আসমান একটি শরীরবিশিষ্ট বিদ্যমান বস্তু। কাজেই কিছু আনকোরা ব্যক্তির মনগড়া মতের ওপর ভিত্তি করে সুস্পষ্ট প্রমাণসমৃদ্ধ বিষয়কে এবং গবেষক ও দার্শনিকদের মতৈক্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও তাদের স্বীকৃত গবেষণাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করা নির্বুদ্ধিতা বইকি।

দ্বিতীয় সংশয়

আসমানের তো অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তা বিদীর্ণ করা ও জোড়া লাগানো সম্ভব নয়।

উত্তর

আকাশ বিদীর্ণ করে ভেদ করা ও তা জোড়া লাগানো অসম্ভব হওয়ার কোনো দলিল নেই। বরং এগুলো শুধু দার্শনিক কিছু কাল্পনিক মতবাদ ও ধারণাপ্রসূত আন্দাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সত্তা নিজ কুদরতে অসংখ্য অগণিত অণু-পরমাণু একত্র করে এত বিশাল বড় আসমান বানাতে সক্ষম, তিনি নিজ কুদরতে তা আবার ভেঙে টুকরো টুকরো করতেও সক্ষম। ভাঙা এবং জোড়া দেওয়া আল্লাহ তাআলার কুদরতে

সবই সমান। এখন বাকি থাকল আকাশ বিদীর্ণ করা ও জোড়া দেওয়া অসম্ভব হওয়ার মাসআলা। আকাশ বিদীর্ণ করা ও জোড়া লাগানো এটি সমস্ত মানবনির্মিত মতবাদে বাতিল বলে গণ্য হলেও আসমানি ধর্মাবলম্বী তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ঐকমত্যে তা বৈধ ও স্বীকৃত।

হজরত ইলিয়াস ও ঈসা আ.-এর আকাশভ্রমণ সমস্ত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিকট একটি স্বীকৃত বিষয়। এখন যদি পাদরি মশাইরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজকে বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব হওয়ার কারণে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে আগে হজরত ঈসা ও ইলিয়াস আ.-এর আকাশভ্রমণ অস্বীকার করতে হবে। আকাশ বিদীর্ণ হওয়া বিবেকের দৃষ্টিতে এ কারণে অসম্ভব নয়, কারণ মহাকাশ গবেষকরা ও অ্যারিস্টটল এবং তার অনুসারীরা আজ অবধি আসমান বিদীর্ণ করা ও জোড়া লাগানো অসম্ভব হওয়ার ওপর অকাট্য কোনো দলিল পেশ করতে পারেনি। দার্শনিকেরা এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যতগুলো দলিল-প্রমাণ দাঁড় করিয়েছে, তার সবগুলোই অত্যন্ত সংশয়ান্বিত ও সন্দেহযুক্ত।

অবশ্য পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও তাদের অনুসারীরা যারা খ্রিষ্টধর্মমতে জ্যোতির্বিদ্যায় ফায়াগ্রুসের নিয়মনীতি অনুসরণ করে, তাদের জন্য এটা মান্য করা কষ্টকর হবে। কারণ তাদের নিকট আসমানেরই অস্তিত্ব নেই। কাজেই তাদের জন্য উচিত মিরাজকে অস্বীকার করার আগে হজরত ইলিয়াস ও হজরত ঈসা আ.-এর আকাশভ্রমণকে অস্বীকার করা। খ্রিষ্টানদের নিকট যেরূপ হজরত ঈসা আ.-এর জন্য আসমান বিদীর্ণ হওয়া এবং তা পুনরায় মিলে যাওয়া সম্ভব, তেমনইভাবে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যও সম্ভব। হজরত ঈসা আ.-এর আকাশভ্রমণও মিরাজই ছিল। তারা মিরাজের ঘটনাকে অবাস্তব ও সাধারণ নিয়মপরিপন্থী হওয়ার কারণে অস্বীকার করলে আমরা তাদেরকে বেনারসের এক গ্রাম্য ব্যক্তির জনৈক পাদরি সাহেবকে দেওয়া উত্তর স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। পাদরি সাহেব আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ অস্বীকার করলে তার উত্তর গ্রাম্য লোকটি এভাবে দিয়েছিলেন, তোমাদের নিকটে আসমানে ভ্রমণ করা যদি অসম্ভব হয়, তাহলে তো এর থেকেও বেশি অবাস্তব ও অসম্ভব হওয়ার কথা একজন কুমারী মহিলা স্বামীবিহীন গর্ভবতী হওয়া এবং সন্তান প্রসব করা। অর্থাৎ সাধারণ দূরবর্তী

বিষয় যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তোমাদের মূলনীতি অনুযায়ী এ ঘটনা আরও বেশি মিথ্যা হওয়ার দাবি রাখে।[৮৩]

তৃতীয় সংশয়

একটি ভারী কায়া নিয়ে এত অল্প সময়ে এ পরিমাণ ত্বরিত গতিতে আসমানে উড্ডয়ন করা, আবার সেখান থেকে ফিরে আসা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

উত্তর

বিবেকের দৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত দ্রুত গতির কোনো সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানের যান্ত্রিক উন্নতি এ সংশয়-সন্দেহকে একেবারেই অপনোদন করে দিয়েছে। উড়োজাহাজ, নভশ্চরণ ইত্যাদির উন্নতি, সমৃদ্ধি ও দ্রুতগতি দিন দিন বেড়েই চলেছে, জানা নেই এ আবিষ্কারের সোপান কোথায় গিয়ে থামবে। বান্দার নিজের সামর্থ্যেরই কূলকিনারা নেই, কিন্তু সে সকল শক্তিসামর্থ্যের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইশকাল-তাশকিলের অবতারণা করে। যুক্তিনির্ভর মূলনীতি অনুযায়ী যখন দুটি বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটে তখন শক্তিশালীটিই প্রাধান্য লাভ করে। ইঞ্জিন ও মেশিনারিজ যন্ত্রাদি ঘনত্ব ও ভারী পদার্থের দ্বারা গঠিত, কিন্তু এর মাঝে বাষ্প, জলীয় তরল পদার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এ সূক্ষ্ম পদার্থই স্বীয় সূক্ষ্মতার কারণে এত শক্তিশালী হয় যে, ভারী যন্ত্রাদিকে কোনো ক্লেশ ব্যতিরেকেই অত্যন্ত সহজতার সাথে নির্বিঘ্নে টেনে নিয়ে যায়। এভাবেই বুঝে নিতে হবে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুহ মুবারক পবিত্র শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে শরীরকে উড্ডয়নশীল বানিয়ে রুহের অনুগামী করে দিয়েছিল। কাজেই তখন অদৃশ্যজগতের ভ্রমণ করা তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল না এবং এতে কোনো আশ্চর্যের বিষয়ও থাকছে না।

কবি বলেন,

রুহের প্রাধান্যতায় যে বদন পেয়েছে সৌকুমার্যের দ্যুতি,

---

৮৩ মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবি রহ, *ইযালাতুল শুকুক*, ১/৩০২,৩০৩, মাহাদুশ শরিআহ, লখনৌ।

আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার মর্যাদা তাকেই করেছে পদচুম্বন।

ফেরেশতা ও জিনজাতির আসমানে আসা-যাওয়া এবং হজরত আদম আ.-এর জমিনে অবতরণ করা ও হজরত ঈসা আ.-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া ও অবতরণ করা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এতে শুধু সংশয় সেই ব্যক্তিই করতে পারে যার হৃদয় হিদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত।

চতুর্থ সংশয়

আসমান ও জমিনের মাঝে ঠান্ডা-গরমের স্তর থাকার কারণে, অর্থাৎ অগ্নিবৃত্ত ও বায়ুবৃত্ত থাকার কারণে প্রাণবান কোনো প্রাণীর সশরীরে সহিহ-সালামতে আসমানে পৌঁছা সম্ভব নয়। কারণ আসমানের নিচে একটি অগ্নিকুণ্ড রয়েছে, যা জানদার কোনো প্রাণীর জন্য দগ্ধ হওয়া ব্যতীত পার হয়ে আসমানে পৌঁছা সম্ভব নয়। আর আসমান জমিনের মাঝে একটি বায়ুবৃত্ত রয়েছে, এটি মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডা ও শীতল হওয়ার কারণে অতিক্রম করা অসম্ভব। বায়ুবৃত্ত থেকে বের হওয়ার পর অক্সিজেন বন্ধ হয়ে যায়, আর কেউ শ্বাস গ্রহণ করা ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে না। কাজেই কারও জন্য আসমানে পৌঁছাও সম্ভব না।

উত্তর

এ অগ্নিকুণ্ডের তথ্যটি গ্রিক দার্শনিক ছাড়া অন্য কারও থেকে পাওয়া যায় না। তবে একদল মুসলিম দার্শনিকের মতে পৃথিবী রাতদিন ঘুরতে থাকে। ধারাবাহিকভাবে এ ঘূর্ণিপাক ও চক্কর দেওয়ার কারণে এক ধরনের উষ্ণতা সৃষ্টি হয়, গ্রিকরা একেই অগ্নিকুণ্ড মনে করে বসেছে। অন্যথায় বাস্তবিক অর্থে এটি কোনো অগ্নিকুণ্ড নয়। যদি মেনেও নেওয়া হয় অগ্নিকুণ্ড বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে, তাহলেও তো উক্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলারই হাতে থাকবে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, বস্তু থেকে কোনো বৈশিষ্ট্যকে আলাদা করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আগুনের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি দগ্ধ করার, অন্যটি আলোকিত করার। সুতরাং অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাআলা কখনো কিছু সময়ের জন্য আগুনের পোড়ানোর বৈশিষ্ট্য বাতিল করে শুধু আলোকরশ্মি অবশিষ্ট রাখবেন। যেমন, চেরি ফুল এবং আতশবাজির মধ্যে আগুনের আলোকচ্ছটা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা কোনোকিছুকে জ্বালায় না। সুতরাং মহামহিম আল্লাহ তাআলার জন্য কি সম্ভব নয়,

তিনি স্বীয় নৈকট্যশীল বান্দার জন্য আগুনের দগ্ধ করার বৈশিষ্ট্য উঠিয়ে নিয়ে কিছু সময়ের জন্য আগুনকে আরামদায়ক শীতলতায় রূপান্তরিত করবেন এবং শুধু আগুনের রশ্মি বাকি রাখবেন? কবি বলেন,

বাতাস পানি আগুন মাটি সবই তো তাঁর বান্দা,

তোমাতে আমাতে মৃত সেসব, খোদার কাছে জিন্দা।

দুই. বর্তমানের আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানীরা এক ধরনের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট উদ্ভাবন করেছে, যা পরিধান করলে বুলেট তথা গুলি ইত্যাদি কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কি এতটুকু শক্তিসামর্থ্য নেই, তিনি নিজ নবির জন্য এমন কোনো পোশাক বানিয়ে দেবেন, যা পরিধান করলে আগুন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না?

তিন. আল্লাহ তাআলার কুদরতে এক প্রকার সামুদ্রিক কীট আগুনের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আগুন তাকে দগ্ধ করে না, বরং আগুন তার জন্য সঞ্জীবনী। তা আগুনে দগ্ধও হয় না আবার বিনাশও হয় না। বরং আগুন থেকে আলাদা হওয়াই তার জন্য মৃত্যুর কারণ।

চার. সরকারি বাগবাগিচায় এমন চারাগাছও থাকে, যার নিচে পানির পরিবর্তে আগুন প্রজ্জ্বলন করা হয়। তা আগুনের তাপেই সবুজ-শ্যামল ও সজীব থাকে। উক্ত বাগানে সামান্য পরিমাণও যদি আগুনের উষ্ণতা হ্রাস পায়, তাহলে তা শুকিয়ে খাক হয়ে যায়।

পাঁচ. পাকস্থলীতে এক ধরনের আগুনজাতীয় পদার্থ বিদ্যমান রয়েছে, যা সমস্ত খাবারকে উষ্ণতায় হজম করে দেয়। কিন্তু পাকস্থলীকে দগ্ধ করে না। এসব দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আগুন কাউকে পুড়িয়ে দেয় আবার কাউকে জীবনও দান করে। কারও জীবিত থাকার মাধ্যম হয়। এ সবকিছুই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ইরাদামাফিক হয়ে থাকে। পৃথিবী এগুলোকে শত শত বরং হাজার বছর ধরে স্বচক্ষে অবলোকন করে আসছে। সুতরাং অবিনশ্বর ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলা যদি আগুনকে সামান্য সময়ের জন্য নিজের কোনো সম্মানিত বান্দার পবিত্র শরীরের হিফাজত করার মাধ্যম বানিয়ে দেন, তাহলে তা তোমরা অসম্ভব মনে করো কোন যুক্তিতে?

ইউরোপের কিছু সায়েন্টিস্ট গবেষণা করে সূর্যলোকে এক ধরনের জীব বসবাস করে বলে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তাদের গবেষণায় এখনো ধরা পড়েনি, এ জীবগুলোকে

কোন উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের দাবিমতেই যখন আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে উত্তপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসাগর সূর্যলোকে কোনো জীব জীবিত রাখতে পারেন, তাহলে কি সেই আল্লাহই নিজের কোনো সম্মানিত বান্দাকে অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করে সহিহ-সালামতে তা অতিক্রম করাতে পারেন না?

বাকি প্রশ্ন হলো বায়ুবৃত্তের বাইরে কেউ শ্বাস গ্রহণ করা ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে না। এ মতটিও সঠিক নয়। কেননা গর্ভের শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া ব্যতীত কয়েক মাস পযন্ত মাতৃগর্ভে জীবিত থাকে। ডুবুরিরা অনেকক্ষণ শ্বাস গ্রহণ করা ব্যতিরেকে পাতালপুরীতে ডুব দিয়ে থাকতে পারে। অথচ আমরা সকলেই জানি, পানির নিচে শ্বাস গ্রহণ করা ব্যতীত জীবিত থাকা যায় না।

দ্বিতীয় দল

এ দলের মতে মিরাজের ঘটনা সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় ছিল না। বরং আত্মিকভাবে ঘুমের জগতে সংঘটিত হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে আসমানে গমন করেননি, বরং তিনি সমস্ত অদৃশ্যজগৎ স্বপ্নযোগে ভ্রমণ করেছিলেন।

উত্তর

মিরাজের ঘটনা যদি নিখাদ স্বপ্নই হতো, তাহলে মক্কার কাফিররা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল কেন? কেনই-বা তারা তাঁর সাথে হাসিতামাশা করেছিল? তারা কেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইতুল মাকদিসের বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল? মিরাজ যদি স্বপ্নযোগেই হবে, তাহলে এটিকেই কেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মুজিজা হিসেবে গণ্য করা হলো? স্বপ্নযোগে আবু জাহল-আবু লাহাবও তো বাইতুল মাকদিসে যেতে পারে!

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মুজিজা

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢

> কিয়ামত সমাগত। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আর কাফিরদের অভ্যাস হলো তারা যদি কখনো নবুয়তের কোনো নিদর্শন বা মুজিজা অবলোকন করে, তখন তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং পানি ঘোলা করার জন্য আদাজল খেয়ে বলে বেড়ায়, এগুলো তো চিরাচরিত জাদু! (সুরা কমার, ১-২)[৮৪]

অবশ্য জ্ঞাতব্য, ইনশাক্কা (اِنْشَقَّ) শব্দটি অতীতকালীন ক্রিয়া। কাজেই একে তার উদ্দিষ্ট অর্থে বহাল রাখাই শ্রেয়। একে ভবিষ্যদবাচক অর্থে রূপান্তরিত করা বেশ কয়েকটি কারণে ভুল।

প্রথম কারণ

কোনো কোনো কিরআতে ইনশাক্কা (اِنْشَقَّ) শব্দ পূর্বে কাদ (قَدْ) শব্দযোগে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রমতে, কাদ শব্দটি যদি অতীতকালীন ক্রিয়াপদের শুরুতে আসে, তাহলে সুনিশ্চিত ও অকাট্যভাবে উক্ত শব্দটি অতীতকালের অর্থই প্রদান করে থাকে। এটিও অত্যাবশ্যক যে, উভয় কিরআতই এক অর্থই বহন করবে। কেননা এক কিরআতের অর্থ অন্য কিরআতের ব্যতিক্রম হওয়া বৈধ নয়।

দ্বিতীয় কারণ

এরপরের আয়াত,

وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

> তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে বেড়ায়, এ তো চিরাচরিত জাদু।[৮৫]

---

৮৪ গ্রন্থকার ভাবার্থ করেছেন।

৮৫ (সুরা কমার, ২)

এটিও একটি উপলক্ষ ও ইঙ্গিতবহ আয়াত। কারণ কাফিরদের উক্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও একে জাদু বলে জ্ঞান করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশার ঘটনা। হজরত আম্বিয়া কিরাম আ.-এর মুজিজা দেখে কাফিররা সব সময় তা জাদু বলে বেড়াত। কিন্তু যখন কিয়ামতপূর্ব অনভিপ্রেত ঘটনাবলি প্রকাশিত হবে, তখন না কোনো কাফির তা মিথ্যা বলতে পারবে, আর না তা জাদু বলে জ্ঞান করবে।

তৃতীয় কারণ

মুফাসসিরিনে কিরাম সবাই একমত, ইনশাক্কা শব্দটি একটি অতীতকালীন ক্রিয়া। কাজেই এর দ্বারা বোঝা যায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা অতীতে ঘটে গিয়েছে। কাজি ইয়াজ রহ. 'শিফা' গ্রন্থে বলেন, এ আয়াতগুলোতে,

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢

> কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলতে থাকে, এ তো সব সময়কার জাদু।[৮৬]

আল্লাহ তাআলা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার এবং কাফিরদের নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন অতীতকালীন শব্দ দ্বারা এবং মুফাসসিরগণ সকলেই একমত যে, তা সংঘটিত হয়ে গিয়েছে। তবে কেউ কেউ ইনশাক্কা দ্বারা ভবিষ্যদবাচক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু তাদের এ মতটি সঠিক নয়। বরং তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের মতপরিপন্থী। মুফাসসিরিনে কিরাম কখনো কখনো বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতার দরুন কোনো দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য মতকে শুধু অবগত করার জন্য উল্লেখ করে থাকেন, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের ঐক্য ও ইজমাবিরোধীও নয়। কবি বলেন,

لَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا ... إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

প্রত্যেক মতানৈক্যই গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত নয়,

---

৮৬ (সুরা কমার, ১-২)

আর সকল মতানৈক্যই প্রশ্ন থেকে মুক্ত নয়।[৮৭]

নাস্তিকতা-পছন্দ এমন স্বভাবধারী ব্যক্তি কেবল এসব দুর্বল কথার তালাশে হণ্যে হয়ে ঘোরে, মাছি যেমন গন্ধযুক্ত বস্তুর তালাশে ভনভনিয়ে ফেরে।

চতুর্থ কারণ

কুরআনের আয়াত ছাড়াও মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা নববি যুগেই ঘটেছিল। এ ঘটনাটি একাধিক সাহাবায়ে কিরাম রা. বর্ণনা করেছেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, যুবায়ের ইবনু মুতইম, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আনাস ইবনু মালিক, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ও অন্যান্য বড় সাহাবি। সবগুলো বর্ণনার সারাংশ হলো, হজের মৌসুমের এক রাতে কাফিররা একত্র হলে আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। তখন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়, জাদুকরের জাদু যেহেতু গ্রহনক্ষত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না, কাজেই তোমরা জাদুকর মুহাম্মাদকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করতে বলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ জানানোর পর তিনি তাঁর শাহাদাত আঙুল মুবারক দ্বারা চাঁদের দিকে ইশারা করলে তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। উপস্থিত দর্শকেরা তা নিজ চোখে পষ্ট দেখতে পায়। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া দেখছ তো? অতঃপর চাঁদ আবার পরস্পরে মিলে যায়। একজন ইহুদি পরামর্শের সময় কাফিরদের সাথে উপস্থিত ছিল। তিনি চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া দেখা মাত্রই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ইমান আনয়ন করেন। কিন্তু আবু জাহল ও অন্য কাফিররা বলতে থাকে, মুহাম্মাদ আমাদের চোখের ওপরেও জাদু করেছে। কিন্তু তার এ জাদু তো আর সমস্ত পৃথিবীর ওপর প্রভাব ফেলবে না। তাই আমরা বহিরাগত মুসাফিরদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখব, তারাও চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া দেখেছে কি না। বহিরাগত মুসাফিরদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তারাও তা স্বীকার করে নেয়, তখন কাফিররা বলতে থাকে, এ তো দেখছি চিরাচরিত জাদু![৮৮]

---

৮৭ আল্লামা যুরকানি, *মানাহিলুল ইরফান*, ১/১৯৯।

৮৮ চন্দ্র বিদীর্ণবিষয়ক ঘটনার বিস্তারিত রয়েছে সুরা কমার ৫৪ : ১-এর ব্যাখ্যায়।

পঞ্চম কারণ

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা মক্কার সমস্ত কাফিরের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। তারা একে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাদু বলে জ্ঞান করত। এর দ্বারা বোঝা যায়, এ ঘটনা সংঘটিত হওয়া তাদের নিকট সর্বজনবিদিত ছিল বিধায়ই তারা একে জাদু বলত। অন্যথায় যে বস্তু সংঘটিতই হয়নি, তাকে জাদু বলার কী কারণ থাকতে পারে? চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া যদি মিথ্যা, বানোয়াট ও অসম্ভবই হতো তাহলে তো তখন মক্কার কাফিররাও মুজিজা অস্বীকারকারী ও বিরোধীদের মতো বলত, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা অবাস্তব ও অসম্ভব, কেননা আসমান গ্রহ, তারা, নক্ষত্র এবং ঘন ও পুরু পদার্থ দ্বারা গঠিত হওয়ার কারণে ভেদ করা ও বিদীর্ণ করা আবার জোড়া লাগানো সম্ভব নয়। মক্কার কাফিররাও তাদের সাথে গলা মিলিয়ে বলত, যদি চাঁদ ফেটে যেত, তাহলে পৃথিবীতে বড় ধরনের ইনকিলাব ঘটত। আসমান জমিন কম্পিত হতো, সমুদ্র ফুলে উঠত, পাহাড় ধসে পড়ত ইত্যাদি ইত্যাদি সংঘটিত হতো।

উত্তর হলো এই

প্রাচীন দার্শনিকেরা আসমান বিদীর্ণ হওয়া ও জোড়া লাগা অসম্ভব বলে দাবি করত। কিন্তু তাদের দাবির পক্ষে তা অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ধ্যানধারণা ও কল্পনাপ্রসূত অলীক সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোনো দলিল নেই। হাল জামানার মহাকাশ বিশেষজ্ঞরা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন, সমস্ত গ্রহ, তারা, নক্ষত্র ও চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি ঘনত্ব ও পুরু পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও এ সবকিছুই বিদীর্ণ হওয়া ও জোড়া লাগা সম্ভব। উল্কাপিণ্ড ও তারকারাজি ইত্যাদি যা মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়, তা কখনো ছিটকে পড়ে আবার আপনা-আপনিই জোড়া লেগে যায়। কখনো তা ছুটে পড়া দৃষ্টিগোচরও হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার কুদরতি কারিশমায় মহাশূন্যের উল্কাপিণ্ড আর জমিনের দেহ ও শরীরবিশিষ্ট বস্তু সবকিছুই একইরকম। কুরআন চৌদ্দশ বছর আগে থেকে জানিয়ে আসছে, আসমান জমিন প্রথমে একসাথে মিলিত ছিল, এরপরে আল্লাহ তাআলা তা পৃথক ও আলাদা করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

> যারা কুফরি করেছে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান জমিন সৃষ্টির প্রাক্কালে সম্মিলিত ছিল, অতঃপর আমি তা পৃথক করে দিয়েছি?[৮৯]

সায়েন্টিস্টরাও স্বীকার করে নিয়েছে, প্রথমে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল একসাথে মিলিত ছিল, পরে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।

সূর্য হটিয়ে দেওয়ার মুজিজা

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার অনুরূপ বুঝে নিতে হবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর বরকতে হজরত আলি রা. যেন আসরের নামাজ আদায় করতে পারেন, তাই সূর্যকে অল্প সময়ের জন্য পিছনে হটিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সূর্য হটে যাওয়ার মুজিজাটি চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিজার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক নয়। প্রথমটি স্বীকার করে নেওয়ার পরে দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করতে তেমন বেশি বেগ পেতে হয় না। কেননা সূর্য হটিয়ে দেওয়া শুধু তার কক্ষপথে সামান্য হেরফের মাত্র, যা স্রেফ অবস্থাগত পরিবর্তন, সত্তাগত কোনো পরিবর্তন নয়। কিন্তু চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া মূল সত্তা ও মৌলিক অংশের মাঝে বিবর্তন সাধন করেছে। আল্লাহ তাআলার কুদরতের বেলায় সত্তা ও গুণে পরিবর্তন ঘটানো সব সমান।[৯০]

---

৮৯ (সুরা আম্বিয়া, ৩০)

৯০ আলি রা.-এর জন্য সূর্য হটিয়ে দেওয়ার বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ*, ৮/১৬৪-১৯৭। তবে বনি ইসরাইলের একজন নবির জন্য সূর্যকে পিছিয়ে দেওয়ার বর্ণনা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। *সহিহ বুখারি*, ৩১২৪, ৫১৫৭। *সহিহ মুসলিম*, ১৭৪৭। ইমাম আহমাদের বর্ণনায়, তিনি ছিলেন ইউশা ইবনু নুন আ.। *মুসনাদু আহমাদ*, ৮৩১৫। সহিহ।

মুহাম্মাদি রিসালাতের প্রয়োজনিয়তা

বর্ষিত হোক তাঁর ওপর লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম

আল্লাহ তাআলা প্রধান বিচারক ও আহকামুল হাকিমিন হওয়া সকলের নিকটই স্বীকৃত। যখন আল্লাহ তাআলার মাবুদ, উপাস্য ও হাকিমে মুতলাক তথা শাশ্বত বিধানদাতা হওয়া সর্বজনস্বীকৃত, তাই বান্দাদের জন্য আবশ্যক তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা। কেননা বিচারক ও শাসকের আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে থাকে। তাহলে বিচারকের বিচারক রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য কীভাবে আবশ্যক না হতে পারে? আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার হেন গুণাবলি নেই যা তাঁর পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান নেই। নিম্নে কিছু গুণাবলি উল্লেখ করা হলো।

এক. তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও অস্তিত্ব দানকারী। তাঁর হাতেই রয়েছে আমাদের বিদ্যমানতার বাগডোর। বিশ্বের সমস্তকিছুর অস্তিত্ব তাঁরই দানকৃত বিশেষ এক রহমত।

দুই. অস্তিত্ব দান করার অনুরূপ বিশ্বজাহানের সমস্ত কল্যাণ ও অকল্যাণ আল্লাহ তাআলারই মুষ্টিবদ্ধ। সূর্যের তাপ ও রশ্মি যদিও জমিনের ওপর পড়ে, কিন্তু উক্ত তাপ ও রশ্মি সূর্যের মধ্যে যে পরিমাণ বিদ্যমান রয়েছে, জমিনে সে পরিমাণ নেই। এমনইভাবে সৃষ্টিজীবের অস্তিত্ব ও তার পরিপূর্ণতা যদিও মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু তা যে পরিমাণ আল্লাহ তাআলার আয়ত্তাধীন রয়েছে, সৃষ্টিজীবের সে পরিমাণ সাধ্যে থাকা ও আয়ত্তাধীন থাকা সম্ভব নয়।

তিন. কল্যাণ-অকল্যাণ ছাড়াও সব ধরনের পরিপূর্ণতা ও সকল রকমের সৌন্দর্যের কারিশমা তাঁর সত্তার বরকতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। কাজেই কারও মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ, সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা ও সৌকুমার্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়, তাহলে তা আল্লাহ তাআলারই জামাল ও কামালের ছিটাফোঁটা মাত্র। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মূল মাহবুব ও প্রকৃত প্রেমাস্পদ প্রকৃতপক্ষে আসমান জমিনের নুর মহান আল্লাহ তাআলাই। কোনো বস্তু প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত হওয়া মূলত তাঁরই জন্য। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যদি প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে, তাহলে তার মধ্যে আল্লাহ তাআলারই পূর্ণতার কোনো জালবা ও কারিশমা প্রতিবিম্ব হওয়ার কারণেই হয়ে থাকবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, আনুগত্যের মূলভিত্তি তিনটি গুণের ওপর নির্ভরশীল। তথা কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করে অস্তিত্ব দান করা। দুই. কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক হওয়া, তিন. সুন্দর ও প্রিয় হওয়া। এ তিনটি গুণাবলির কারণেই একজন অন্যজনের আনুগত্য করে। গোলাম তার মনিবের আনুগত্য করে কারণ সে তার মালিক। প্রজা তার শাসকের আনুগত্য করে লাভ-উপকারের আশায়। প্রেমিক তার প্রিয়াকে সৌন্দর্য ও ভালোবাসার টানে আনুগত্য করে। সুতরাং যখন এ তিনটি বিষয়ই মৌলিকভাবে আল্লাহ তাআলার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে, কাজেই সব ধরনের আনুগত্য ও উপাসনা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই হওয়া উচিত।

আনুগত্যের বাস্তবতা

যখন প্রমাণিত হয়ে গেল সব ধরনের আনুগত্যের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলাই, তাহলে এখন বুঝতে হবে আনুগত্য, অনুসরণ ও হুকুম পালন এবং গোলামি করা কাকে বলে এবং এর বাস্তবতা কী। কারও সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার নাম ইতাআত তথা আনুগত্য। আর অসন্তুষ্টি ও ইচ্ছার পরিপন্থী কাজ করার নাম গুনাহ ও অবাধ্যতা। মোটকথা আনুগত্য ও অনুসরণ আদেশ দানকারীর মর্জিমাফিক হওয়া আবশ্যক। তবে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির স্বরূপ হলো, যেহেতু সাধারণত মানুষের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিও আমরা বাতলে দেওয়া ব্যতীত অবগত হতে পারি না, তাহলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কীসে এবং অসন্তুষ্টি কোন বস্তুতে, বাতলে দেওয়া ব্যতীত কীরূপে জানতে পারব?

মানবীয় শরীরের থেকে বড় কোনো প্রকাশ্য নিদর্শনীয় বস্তু নেই। এরপরেও এর অবস্থা হলো, যদি সিনার সাথে সিনা লাগিয়ে দেওয়াও হয়, বরং এর থেকেও আগে বেড়ে বুক চিরে অন্তরকে বস্তুতে রূপান্তরিত করে সামনে রেখে দেখিয়ে দেওয়াও হয়, তবুও অন্তরের কথা জানা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ তাআলা তো হলেন সব থেকে বড় লাতিফ ও সূক্ষ্মদর্শী, তাহলে তাঁর অন্তরের কথা বাতলে দেওয়া ব্যতীত কীভাবে অবগত হওয়া সম্ভব?

মোটকথা পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বস্তু অবগত হওয়া ব্যতীত কারও আনুগত্য ও অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে তিনি কোনটি পছন্দ করেন, কোনটি অপছন্দ করেন, কীসে সন্তুষ্ট হন, কোন কাজে অসন্তুষ্ট হন জিজ্ঞাসা করা মানুষের শক্তিসামর্থ্য ও সাধ্যের বাইরে। আর শুধু বিবেক দিয়ে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় বস্তু জানাও সম্ভব নয়। আমরা যদি আমাদের

বিকলাঙ্গ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা দু-একটি বিষয় জানতেও পারি, তবে তা উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট নয়। এ ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা আমরা কতটুকুই-বা জানতে পারি?

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলার সকল বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধ আমাদের বোধগম্য ও বিবেকগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয়। আশ্চর্যের কী হতে পারে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অমুখাপেক্ষিতার ওপর ভিত্তি করে ইন্দ্রিয়গাহ্য নয় এমন কোনো বিধান দিয়ে থাকবেন যা আমাদের বিবেকবুদ্ধি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে অক্ষম? সুতরাং এর দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বান্দাদের অবহিত করা ব্যতিরেকে অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়ার মাধ্যম

আল্লাহ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ ও আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম তাঁর কালাম। কেননা আল্লাহ তাআলা হলেন, মুতাকাল্লিম, চির কথক, অসীম শক্তিধর এবং মহাজ্ঞানী। তাঁর মুতাকাল্লিম তথা কথক হওয়ার অর্থ, বান্দাদের মধ্য হতে যে তাঁর দরবারে সব থেকে বেশি নৈকট্যশীল ও মর্যাদার অধিকারী, তাকে তিনি নিজ খেতাব ও তার ওপর স্বীয় কালাম অবতীর্ণ করে সম্মানিত করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর বিধানকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। আমরা দুনিয়ার রাজাবাদশা ও ধ্বংসশীল জগতের প্রেমাস্পদদেরকে দেখে থাকি, তারা এ রূপক রাজত্ব ও নামকাওয়াস্তে ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে যাকে-তাকে নিজেদের ভাষ্যকার নির্ধারণ করে অন্তরের গোপন সংবাদ তাদেরকে অবগত করে না। সুতরাং কীভাবে সম্ভব হতে পারে আল্লাহ তাআলা যাকে-তাকে নিজের দরবারের ভাষ্যকার এবং নিজের তরজুমান বানিয়ে নেবেন? এবং নবি ও রাসুলদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজেই বান্দাদের আদেশ-নিষেধ জানিয়ে দেবেন?

সুতরাং সম্রাট-নৃপতিদের বিধিবিধান যেমন প্রজাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য নায়েব ও উজিরের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়, তেমনই রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলা স্বীয় বিধিনিষেধ তাঁর দরবারে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত ও নৈকট্যশীল বান্দাদের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে থাকেন। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ হিদায়াত ও বিধিবিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, মুসলিমগণ এমন বিশেষ নৈকট্যশীল ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে নবি, রাসুল ও পয়গম্বর বলে থাকেন। আর তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধকে বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেন। অতঃপর উম্মতের উলামা ও ফুকাহা তা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও ঘোষণা করে মানুষকে জানিয়ে দেন।

নবির নিদর্শন

স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত হজরত আম্বিয়া কিরাম আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্যশীল নির্ভরযোগ্য বান্দা এবং প্রতিনিধি ও বার্তাবাহক। পৃথিবীর রাজাবাদশাদের নৈকট্য অর্জন করার জন্য যেমন বিভিন্ন উৎকৃষ্ট ও বিশেষ বিশেষ গুণাবলির পরিপূর্ণতায় ভূষিত হতে হয়, তেমনই আল্লাহ তাআলার দরবারে নৈকট্যশীল ও বিশেষ মর্যাদায় উপনীত হওয়ার জন্য এর থেকেও অধিক গুণাবলি ও পরিপূর্ণতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। রাজাবাদশারা ধ্বংসশীল দুনিয়ার রূপক রাজত্বের মালিক হওয়া সত্ত্বেও নির্বোধ, গোঁয়ার স্বভাবধারী ও কাপুরুষ এবং বাদশাহ ও তার রাজত্বের দুশমন এমন ব্যক্তিদেরকে তাদের সিংহাসনের নিকটে কস্মিনকালেও পা ফেলার অনুমতি দেয় না। তাহলে আল্লাহ তাআলা কীভাবে স্বীয় দূতালি ও প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে পারেন, যার জ্ঞান অপূর্ণ, চরিত্র কুলষিত এবং আমানতদারি ও আনুগত্য ধুরন্ধরতা ও ধোঁকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন?

নবুয়তের ভিত্তি তিনটি গুণের ওপর নির্ভরশীল। নবিদের জন্য প্রথম আবশ্যক জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ও বুঝের পরিপক্বতার গুণে গুণান্বিত হওয়া। কেননা আল্লাহ তাআলার কালামে পাকের নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান বোঝা এবং তাঁর বিধানাবলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণসমূহ অবগত হওয়া এবং সেগুলো সুচারুরূপে বান্দাদেরকে বোঝানো পরিশুদ্ধ জ্ঞান ও সঠিক বুঝ ব্যতীত সম্ভব নয়। কারণ অপূর্ণ ও ভ্রান্ত বুঝ স্বয়ং নিজেও একটি ত্রুটি যা থেকে নবুয়তের দরজা পূত ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত প্রশংসিত চরিত্র ও চরিত্রমাধুরীর শুভ্রতায় অনন্য হওয়া, কেননা উত্তম চরিত্র পুণ্যময় সকল কাজের মূল। উত্তম চরিত্রাবলি স্বভাবগতভাবেই নবির আচারব্যবহারে প্রাধান্যশীল হওয়ার দরুন তিনি যে কাজই করুন না কেন উম্মাহর জন্য তা আদর্শ ও অনুসরণীয় হয়ে থাকে। যে কাজই তাঁর থেকে প্রকাশিত হোক না কেন, তা হিদায়াতের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়। আমলের ভিত্তি চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই যার যে ধরনের চরিত্র ও যোগ্যতা রয়েছে তার থেকে সে ধরনের কাজকর্ম প্রকাশিত হয়। দানশীল ব্যক্তি থেকে মহানুভবতা ও দানশীলতা প্রকাশ

পাবে এটাই স্বাভাবিক। কৃপণ থেকে কৃপণতা ও কঞ্জুসিভাবই কেবল প্রকাশ পাবে এটাই যৌক্তিক।

তৃতীয়ত নবিদের জন্য আবশ্যক তারা সর্বদা আপাদমস্তক আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবেন। তাদের ভেতর-বাহির এ পরিমাণ আনুগত্যশীল হবে যে, সামান্য পরিমাণ অবাধ্য হওয়ার অবকাশও থাকবে না। এর নামই হলো ইসমাতে আম্বিয়া তথা নবিগণ নিষ্পাপ হওয়ার প্রকৃত মর্মার্থ।

দুনিয়ার রাজাবাদশারাও নিজেদের নৈকট্যশীল আমলাদেরকে প্রতিনিধি ও বার্তাবাহক বানিয়ে থাকে। তারাও তাদের আনুগত্যশীল ও ফরমাবরদার হয়। তবে পৃথিবীর রাজাবাদশারা কখনো কে যোগ্য-উপযোগী ও বিরোধী, কে বাধ্য-অবাধ্য এবং নিষ্ঠাবান ও চক্রান্তকারী বুঝতে ভুল করার কারণে পরে তাদেরকে মন্ত্রিত্ব ও দূতালির পদ থেকে বহিষ্কৃত ও বরখাস্ত করতে হয়। কিন্তু সবজান্তা আল্লাহ তাআলার নিকট সকলের অভ্যন্তর ও বাহ্যিক অবস্থা সবকিছুই সমান। তাঁর জ্ঞানে কখনো ভুল হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে আম্বিয়া কিরাম নবুয়তির পদমর্যাদা ও দায়িত্ব থেকে কখনো বরখাস্ত বা বহিষ্কৃতও হন না। কারণ আল্লাহ তাআলা উক্ত বান্দাকে নিজের নবি, বার্তাবাহক ও নৈকট্যশীল করেছেন। তিনি তাঁর চিরাচরিত জ্ঞান দ্বারা আগে থেকেই জানেন এ বান্দা সদাসর্বদা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সকল আদেশ-নিষেধে তাঁর অনুগত থাকবেন।

দালায়িলুন নবুওয়া

মোটকথা উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় তথা পরিপূর্ণ বিবেক, প্রশংসিত চরিত্র ও পূর্ণ নিষ্কলুষতা নবুয়তের ভিত্তিমূল। চতুর্থটি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদেরকে দেওয়া শরিয়া। আর এ শরিয়াকেই ইলমে নবুয়ত বা নববি জ্ঞান বলা হয়। পঞ্চমত মুজিজা যা তাদের জন্য দলিল-প্রমাণ এবং নবুয়তের দাবিদাওয়ার জন্য অকাট্য প্রমাণ ও সুস্পষ্ট দলিলস্বরূপ। এ কারণে কুরআনে কারিমে জায়গায় জায়গায় মুজিজাকে আয়াতে বাইয়িনাহ ও হুজ্জাহ এবং বুরহান নামে ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাহ্যিক কোনো উপায়-উপকরণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবিদের হাতে সাধারণ নিয়মপরিপন্থী যে অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হয়ে অন্য সমস্ত মানুষকে এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম ও অপারগ করে দেয় তাকে মুজিজা বলে। মুজিজা নবিদের কাজ নয় বরং আল্লাহ তাআলার কাজ, যা নবিদের হাতে প্রকাশিত হয় মাত্র।

মুজিজা দেখা মাত্রই নবিদের সত্যতা ও সততার প্রতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, অন্তর তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে শুধু লাচারই নয়, বরং তা সত্য ও বাস্তব বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। মুজিজা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও অসীম ক্ষমতার অপ্রতিরোধ্য এমন নিদর্শন, যার শান-শওকত ও দাপটের সামনে কারও পা স্থির থাকতে পারে না, বরং ইচ্ছার লাগাম হাত থেকে ছুটে গিয়ে তার দিকে ধাবিত হয়। মুজিজার সামনে ঝগড়াবিবাদ ও বাগবিতণ্ডার সমস্ত রাস্তা রুদ্ধ হয়ে যায়। দর্শকেরা দেখে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, এ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়োজিত ও অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং কোনো হতভাগা যদি মুজিজা দেখার পরেও স্বীয় কুফরিতে জমে থাকে, তাহলে এটা তার সুস্পষ্ট বিদ্বেষ ও পষ্ট গোঁয়ারতুমি এবং তার চিরস্থায়ী ব্যর্থতার আলামত।

নেপথ্য উদ্‌ঘাটন করার নিমিত্তে আগমন

নবুয়ত ও রিসালাতের উপর্যুক্ত মানদণ্ড বুঝে নেওয়ার পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতের প্রামাণ্যতা খুব সহজে বোঝা যায়। সকলের জন্য উচিত প্রথমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ বোধবুদ্ধি ও বুঝ-সমঝ এবং হাকিমানা বিবেক নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। কেননা তাহলে দেখা যাবে তা সব থেকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও পরিপূর্ণ। বোধবুদ্ধির পরিপূর্ণতা ও পরিপক্বতার এর থেকে বড় দলিল আর কী হতে পারে যে, তিনি একজন উম্মি তথা নিরক্ষর ছিলেন, অর্থাৎ কারও থেকে এক অক্ষরও শেখেননি এবং কারও নিকটে একটি শব্দও পড়েননি। তিনি পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে জন্মেছেন, যেখানে সমঝদার হয়েছেন, যে দেশে জীবনের পুরো সময় গুজরান করেছেন তা ছিল একেবারেই জ্ঞানশূন্য মূর্খতার মরুভূমি। না সেখানে জাগতিক জ্ঞানের চর্চা ছিল, না দ্বীনী ইলম শিক্ষাদীক্ষার কোনো কেন্দ্র ছিল। না কোনো আসমানি কিতাব ছিল, না জমিনি কোনো গ্রন্থ ছিল। সমস্ত পৃথিবী মূর্খতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও জ্ঞানের নাম ও নিশানা বাকি ছিল না। এরকম দেশে একজন নিরক্ষর মানুষ প্রকাশিত হয়ে এমন দ্বীন ও নিয়মনীতি এবং উপমাহীন এমন একটি কিতাব ও সুস্পষ্ট হিদায়াত নিয়ে আগমন করলেন, যা আরব্য জাহিলদেরকে অল্পদিনের মধ্যেই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের সকল শাখাপ্রশাখা তথা ইবাদতসংক্রান্ত জ্ঞান, নীতিবিদ্যা, মুআমালা ও মুআশারা এবং জীবিকা অর্থাৎ ব্যবসাবাণিজ্যের কলাকৌশলে এমন দক্ষ বানিয়েছিলেন, তাদের নামের কাছে অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর

মতো দার্শনিকেরাও বেজায় অসহায়। মরু সাহারার ওই বেদুইন উট অপহরণকারীরাই জ্ঞান ও সভ্যতায় একেকজন পৃথিবীর এমন দৃষ্টান্ত হয়ে গেলেন, যা কোনোদিন কোনো জাতি অতীতে পেশ করতে পারেনি, আর না ভবিষ্যতে পেশ করতে পারবে। ইলম ও হিকমতের এ ধারাবাহিকতায় ইমাম গাজ্জালি রহ.-এর মতো হাজারো গাজ্জালি ও ইমাম রাজি রহ.-এর অনুরূপ হাজারো রাজি জন্ম নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের ইলম ও হিকমত এবং বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানবিজ্ঞান আবিষ্কার করে সেগুলোর ওপর লম্বা লম্বা কিতাব রচনা করে গেছেন, যা তাদের জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করার জন্য এখনো ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান। কাজেই যে জাতির ফয়েজ ও বরকতপ্রাপ্ত সাধারণ লোকদের ইলম ও হিকমতের যখন এ অবস্থা, তাহলে তাদের প্রধান শিক্ষক ও প্রথম উস্তাদের অবস্থা কী ছিল সহজেই অনুমেয়। শাগরিদের জ্ঞানের পরিপক্কতা উস্তাদের জ্ঞানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ বহন করে। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়িন থেকে বিভিন্ন ধরনের কামাল ও কারিশমা প্রকাশিত হওয়া প্রমাণ করে, এ সমস্ত পরিপূর্ণতা, ইলম ও জ্ঞান সবকিছুই মুহাম্মাদি সত্তায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রোথিত ছিল, আর এগুলো তার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও বিস্তারিত রূপ।

দ্বিতীয়ত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজার হাজার ভবিষ্যদবাণী করেছেন, এর অনেকগুলো তাঁর জীবদ্দশায়ই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তির এ ধরনের অদৃশ্য ও ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বিষয়াবলির খবর দেওয়ার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তাঁর সাথে অদৃশ্যজগতের বিশেষ সুনিবিড় সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ তাআলার জানানো ও অবগত করার মাধ্যমে এ সকল বিষয়াবলি তিনি জানতে পারতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক মাধুর্যের এ অবস্থা ছিল যে, তিনি না কোনো বাদশাহ ছিলেন, না ছিলেন কোনো শাহজাদা। না কোনো বিত্তবান আমির ছিলেন। না ছিলেন কোনো বিত্তশালীর বেটা। তাঁর হাতে ধনদৌলত ও ঐশ্বর্যের নামগন্ধও ছিল না। এমন দরিদ্রতা ও অসচ্ছলতা সত্ত্বেও মরুচারী আরব্য পাষণ্ড শুষ্ক হৃদে শুধু তাঁর প্রতি নিখাদ ভালোবাসাই ছিল না, বরং তারা তাঁর জন্য নিজেদের গর্দান পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর থেকে ঘাম ঝরলে তাদের শরীর থেকে ঝরত রক্ত। তাদের এ কুরবানি ও আত্মত্যাগের জোশ ও জজবা শুধু দুয়েক দিনের জন্য ছিল না যে, আজ আছে কাল নেই, বরং জীবনের অন্তিম সময়ও তাদের এ আফসোস হয়েছে, হায়! রাসুলের জন্য যদি আমার জীবন কুরবান হতো!

এ অকৃত্রিম ভালোবাসার উত্তাল তরঙ্গ এখানেই থেমে যায়নি, বরং যখন তিনি হিজরত করেছেন, তারা তাদের পরিবার-পরিজন, ভিটাবাড়ি এমনকি প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে আসতেও দ্বিধা করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের অগাধ ভালোবাসা পৃথিবীর সবকিছুকে ভুলিয়ে মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করতে তারা ছিলেন ঝাঁপিয়ে পড়া পঙ্গপালের মতো, আদেশ আসতেই লাফিয়ে পড়তেন। তাহলে তা জাদুময়ী চরিত্র নয়তো কী? তিনি কি এ ভালোবাসা হস্তবলে বা তলোয়ারের জোরে অর্জন করেছিলেন, আমাদেরকে কেউ একজন বলুন! এমন চরিত্র কবে কোথায় কার মধ্যে বিদ্যমান ছিল?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসমত, নিষ্কলুষতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধতার এ অবস্থা ছিল যে, দিবাযামী ইবাদতে মশগুল থাকতেন। দুমাস পর্যন্ত চুলোয় রুটির তাওয়া চড়ত না। খেজুর আর পানি ছাড়া কোনো খাবার থাকত না। কিন্তু এ অসচ্ছলতা কখনোই নামাজ, রোজা, রাত্রিজাগরণ এবং উম্মতের তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোদাভীতি, পরহেজগারি, আমানত ও দ্বীনদারি তাঁর দুশমনদের মধ্যেও প্রবাদতুল্য ছিল।

চতুর্থত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দ্বীন ও শরিয়া পৃথিবীর সামনে পেশ করেছেন, তা এমন পরিপূর্ণ ও বিবেকগ্রাহ্য দলিল-প্রমাণসমৃদ্ধ যে, পৃথিবী তা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তিনি যে দ্বীন ও শরিয়া এবং উপমাহীন কিতাব পেশ করেছেন, তা ইবাদত, মুআমালা, আখলাক, তাহজিব-তামাদ্দুন ও বিচারকার্যাবলি এবং বৈশ্বিক নিয়মনীতিকে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত ও পরিগঠিত করেছে যে, বর্তমান দুনিয়ার জবরদস্ত দার্শনিক ও লেখকরা এর সাথে সামান্য সাদৃশ্যতম আইনকানুনও পেশ করতে সক্ষম হবে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মানবীয় শক্তির পরিধি ও সাধ্যের সীমা থেকে তা বহুগুণ ঊর্ধ্বের, বরং তা আসমানি ওহি ও রব্বানি তালিম ছিল।

পঞ্চমত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করা হয়েছে সুস্পষ্ট মুজিজা ও উজ্জ্বল নিদর্শন, যা সহিহ, গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ মুজিজাসমূহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতের দ্ব্যর্থহীন দলিল ও অকাট্য প্রমাণ। প্রত্যেক নবিকে যে মুজিজা দান করা হয়েছে, তা দুয়েক প্রকারের ছিল। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব ধরনের সব রকমের মুজিজা দান করা হয়েছে। তা এত অধিক ছিল যে, উলুল আজম (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) নবিদের ও প্রসিদ্ধ পয়গম্বরদেরকে যে পরিমাণ মুজিজা দান করা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিজার সংখ্যা তাদের সকলের মুজিজার সামষ্টিক সংখ্যা থেকেও অধিক ছিল।

এমনইভাবে যে-সমস্ত পরিপূর্ণতা পূর্ববর্তী সকল নবির পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান ছিল, তার সবগুলোই আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুকাদ্দাস সত্তায় বিদ্যমান রয়েছে। তেমনইভাবে মুজিজার সমস্ত প্রকার ও ধরন যা পূর্ববর্তী আম্বিয়া কিরাম আ.-কে দান করা হয়েছিল, তার সবগুলোই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামষ্টিক মুজিজার মধ্যে পরিগণিত রয়েছে।

রিসালাতে মুহাম্মাদির প্রামাণ্যতা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত প্রমাণিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে, এগুলোর মধ্য হতে আমরা এখানে দশটি উল্লেখযোগ্য কারণ উল্লেখ করছি।

প্রথম কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজার হাজার ভবিষ্যদবাণী করেছেন যা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। শত শত ভবিষ্যদবাণী এ যাবৎ পূর্ণ হয়েছে আর বাকি যেগুলো শেষ জামানায় ব্যাপারে ছিল তা সংঘটিত হয়ে আসছে। এগুলোর কিছু ভবিষ্যদবাণী কুরআনে কারিমে উল্লেখিত হয়েছে আর কিছু সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শত শত মুজিজা প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই ইয়াহুদি ও নাসারাদের নিকট যেমন হজরত মুসা এবং ঈসা আ.-এর মুজিজা প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা নবুয়ত প্রমাণিত হতে পারে, তেমনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুজিজা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমেও নবুয়ত ও রিসালাত প্রমাণিত হবে।

তৃতীয় কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাদীক্ষা ও পরিচর্যা এবং তত্ত্বাবধান একটি বেদুইন ও বর্বর জাতি যারা জাগতিক ও ধর্মীয় জ্ঞান থেকে একেবারেই বাইরের জগতে ছিল, অল্প কদিনের মধ্যেই ইলম-হিকমত ও শিক্ষাদীক্ষায় পৃথিবীর উপমাহীন জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতিতে রোম ও পারস্যের বিজয়ী বীর বানিয়ে দিয়েছিল। যা তাদের বড় বড় শত্রুও বিনা বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে।

চতুর্থ কারণ, আহলে কিতাবরা তাদের পবিত্র কিতাবের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সত্ত্বেও তাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ ও তাঁর বিভিন্ন গুণাবলি অবশিষ্ট ছিল। তাদের কেউ কেউ এগুলো দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ইমানও আনয়ন করেছেন এবং স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনিই শেষ নবি, যার সুসংবাদ হজরত মুসা ও হজরত ঈসা আ. দিয়েছিলেন। খ্রিষ্টানরা ইনজিলের অনেক সুসংবাদ ও ভবিষ্যদবাণীকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, কিন্তু 'ইনজিল বারনাবাস'-এ এমন কিছু অংশ রয়েছে, তাতে কোনো রকমের গরমিল করার উপায়-উপায়ান্তর খ্রিষ্টানদের হয়ে ওঠেনি।

পঞ্চম কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন। না কোনো জ্ঞানের চর্চা করেছেন, আর না কোনো বিদ্বান ও ধর্মগুরুর থেকে ইলম অর্জন করেছেন। চল্লিশ বছর এভাবেই কেটে গেছে। এরপরে তিনি নবুয়তের দাবি করে এমন একটি লা-জওয়াব কিতাব অর্থাৎ কুরআন মাজিদ দুনিয়ার সামনে পেশ করে বলেছেন, এটি আল্লাহর কালাম। সুতরাং তা আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের সামান্যতম সংশয় থাকে, তাহলে তোমরা সকলে মিলে এর অনুরূপ মাত্র একটি সুরা পেশ করো। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত কবি-সাহিত্যিক ও আলংকারিক এবং বাগ্মীরা এর উদাহরণ পেশ করতে শুধু অক্ষমই হয়নি বরং তারা নির্দ্বিধায় স্বীকারও করে নিয়েছে, এটি কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়। কুরআনের সাথে সাথে পৃথিবী ও জাতির জন্য রেখে গেছেন তাঁর মুখনিঃসৃত দিগনির্দেশনা ও 'জাওয়ামিউল কালিম' (স্বল্প শব্দবিশিষ্ট ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যগুচ্ছ) এবং উত্তম উত্তম কথামালা তথা হাদিস শরিফ, যাকে শরিয়তে মুহাম্মাদি বলা হয়। এতে বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস, উত্তম চরিত্রাবলি, ইবাদত, আচারব্যবহার ও রাজনীতি এবং রাষ্ট্রপরিচালনার এমন সব অভিনব ও আশ্চর্যজনক মূলনীতি ও আইনকানুন রয়েছে যে, দুনিয়ার সভ্যতার দাবিদার কোনো জাতি এর আশপাশেও ভিড়তে পারবে না।

ষষ্ঠ কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা ও শরীর মুবারকে এমন কিছু অবস্থা ও গুণাবলি বিদ্যমান ছিল, যা এক সত্তায় একত্র হওয়াই প্রমাণ করে, এ সত্তা গুণে ও শারীরিক অবস্থায় এক পরিপূর্ণ সত্তা। এবং আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত নিকটবর্তী ও সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দা। নিম্নে এর কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো।

এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীর মুবারকের ছায়া ছিল না। হাদিসটি হাকিম তিরমিজি রহ. যাকওয়ান রা. থেকে মুরসাল হিসেবে, ইবনুল মুবারক ও ইবনুল জাওযি রহ. ইবনু আব্বাস রা. থেকে মাওসুল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৯১]

---

৯১. ইমাম কসতুলানি, *মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ*, ২/৮৫। ইমাম যুরকানি, *শরহুল মাওয়াহিব*, ৫/৫২৫। সুয়ুতি, *খাসাইসুল কুবরা*, ১/১২২। বর্ণনাটির সনদ গ্রহণযোগ্য নয়। হাকিম তিরমিজি রহ. আবদুর রহমান ইবনু কায়স যাফরানি হতে বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন। ইবনু কায়স যাফরানির বিরুদ্ধে জাল হাদিস বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। *তারিখু বাগদাদ*, ১০/২৫১, ২৫২। *মিযানুল ইতিদাল*, ২/৫৮৩। *তাহযিবুত তাহযিব*, ৬/২৫৮। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছায়া না থাকা বিষয়ক সহিহ কোনো বর্ণনা নেই। তবে তুলনামূলক শক্তিশালী সনদে ছায়া থাকার বর্ণনা পাওয়া যায়। *মুসনাদু আহমাদ*, ২৬৮৬৬। দারুল উলুম দেওবন্দ ও আশরাফ আলি থানবি রহ.-ও একই কথা

দুই. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর মুবারকে মশা-মাছি বসত না।[৯২]

তিন. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাকাপড়ে পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি পড়ত না।[৯৩]

চার. তিনি খতনা করা অবস্থায় ও নাভির নাড়ি কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হাদিসটি ইমাম তাবারানি ও আবু নুআইম রহ. বর্ণনা করেছেন।[৯৪]

পাঁচ. ঘুমানোর সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিল জাগ্রত থাকত। ঘুমন্ত সময়ও জাগ্রত থাকার অনুরূপ হুঁশ থাকত।[৯৫]

ছয়. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে থেকে যেমন দেখতেন, পেছন থেকেও ঠিক তেমনই দেখতেন।[৯৬]

বলেছেন। *ইমদাদুল মুফতিন*, ২/২৫৮, দারুল ইশাআত, *ইমদাদুল ফাতাওয়া*, ৫/৪০৫, দারুল উলুম করাচি। তবে দারুল উলুম দেওবন্দ তাদের এক অনলাইন ফাতওয়াতে (১৫৫৪৯৯-এ) বিশেষ অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছায়া না পড়াকে অসম্ভব কিছু নয় বলেই মন্তব্য করেছে। হাম্বলি ফকিহ ইমাম বুহুতি রহ.-এর বক্তব্য হতেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। *কাশশাফুল কিনা*, ৫/৩২।

৯২. ইমাম কসতুলানি, *মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ*, ২/৩৪৩। ইমাম যুরকানি, *শরহুল মাওয়াহিব*, ৭/২০০। সুয়ুতি, *খাসাইসুল কুবরা*, ১/১১৭। মোল্লা আলি কারি, *শরহুশ শিফা*, ১/৩০০।

৯৩ প্রাগুক্ত।

৯৪ *খাসাইসুল কুবরা*, ১/৯০। এই মুজিজার পক্ষে ইমাম সুয়ুতি যত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তার কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়। প্রায় প্রতিটি বর্ণনার সনদেই অজ্ঞাত বা পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইবনু সাআদ, *তবাকাতুল কুবরা*, ১/৮২। আবু নুআইম, *তারিখু ইসবাহান*, ১/১৯২। হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, ৪১৭৭ নম্বর হাদিসের সনদবিষয়ক আলোচনায়। তবে বিষয়টি ব্যাপক প্রসিদ্ধ। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খতনা বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। ১. তিনি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ করেন। ২. জিবরিল আ. তাঁর খতনা করিয়েছেন। ৩. আরবের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী দাদা আবদুল মুত্তালিব উপযুক্ত সময়ে তাঁর খতনা করিয়ে দেন। বিস্তারিত : *তুহফাতুল মাওদুদ*, ২০১-২০৭ এবং *যাদুল মাআদ*, ১/৮২।

৯৫ *সহিহ বুখারি*, ১১৪৭, ২০১৩। *সহিহ মুসলিম*, ৭৩৮।

৯৬ *সহিহ বুখারি*, ৪১৮, ৭৪১। *সহিহ মুসলিম*, ৪২৪, ৪২৬।

সাত. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কখনো স্বপ্নদোষ হয়নি। ইমাম তাবারানি রহ. ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কখনো স্বপ্নদোষ হয়নি, কেননা স্বপ্নদোষ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।[৯৭]

আট. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশাব-পায়খানা জমিনে পড়তেই মাটি তা তৎক্ষনাৎ গিলে ফেলত। তাঁর পেশাব-পায়খানা কেউ কখনো দেখেনি এবং উক্ত জায়গা থেকে মিশকের ঘ্রাণ আসত। এ রেওয়ায়েতটি ইমাম বাইহাকি, তিরমিজি, হাকেম রহ.-সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।[৯৮]

নয়. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো হাই তোলেননি। [৯৯] তিনি কখনো অট্টহাসি দেননি।[১০০]

---

৯৭ সুয়ুতি, *খাসাইসুল কুবরা*, ১/১২০। মোল্লা আলি কারি, *শরহুশ শিফা*, ১/৩০০। তাবারানি, *মুজামুল কাবির*, ১১৫৬৪। সনদ হাসান গরিব।

নবি ও রাসুলগণের স্বপ্নদোষ হতো কি না তা নিয়ে ৩টি মত পাওয়া যায়। যথা :

১. এটা অসম্ভব। দলিল : প্রাগুক্ত; ইবনুল মুলাক্কিন, *খাসাইসুর রাসুল*, ২৯০। *সহিহ বুখারি*, ৩২৯২। *সহিহ মুসলিম*, ২২৬১। ইবনু হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, ৪/১৪৪।

২. নবি-রাসুলদেরও এমনটা হওয়া সম্ভব। কারণ সবসময় এতে স্বপ্নের ভূমিকা থাকে না। *সহিহ মুসলিম*, ২২৬১। ইবনু হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, ৪/১৪৪।

৩. স্বপ্নদোষ বলতে যদি ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত উদ্দেশ্য হয়, তবে নবি-রাসুলদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটা অসম্ভব নয়। *ফাতাওয়া ইবনু হাজার হায়তামি*, ৪/৩৩৪।

তবে বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা ও ইমাম তাবারানির বর্ণনার ভিত্তিতে বিষয়টিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিজা হিসেবে মেনে নিতে সমস্যা নেই।

৯৮ *খাসাইসুল কুবরা*, ১/১২০, ১২১। এই মুজিজার স্বপক্ষে ইমাম সুয়ুতি রহ. বেশ কিছু বর্ণনা এনেছেন। তন্মধ্যে ইমাম হাকিমের বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম জাহাবি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এবং ইমাম দারাকুতনির বর্ণনাটিতে মুফরাদ রাবি থাকলেও বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য। *মুসতাদরাকু হাকিম*, ৬৯৫০। ইবনুল জাওযি, *ইলালুল মুতানাহিয়াহ*, ২৮৯।

৯৯ *খাসাইসুল কুবরা*, ১/১১২। *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা*, ৭৯৮২। মুরসাল। তবে বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। তা ছাড়া বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় 'হাই তোলা'-কে আল্লাহর অপছন্দনীয়, শয়তানের পক্ষ থেকে আসে বলে বর্ণিত হয়েছে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মানানসই নয়। *সহিহ বুখারি*, ৩২৮৯, ৬২২৩, ৬২২৬। *সহিহ মুসলিম*, ২৯৯৪।

১০০ ইমাম যুরকানি, *শরহুল মাওয়াহিব*, ৫/৫/৪৪৫-৪৫০। *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, ৬৪৬১। সহিহ। *সুনানু তিরমিজি*, ৩৬৪২। সহিহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় মুচকি হাসতেন। তাই অট্টহাসির প্রশ্নই আসে না।

দশ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো মজলিসে উপস্থিত থাকতেন, যদিও তাঁর থেকে লম্বা শরীরবিশিষ্ট মানুষ উক্ত মজলিসে উপস্থিত থাকত, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সব থেকে উঁচু দৃষ্টিগোচর হতো।[১০১] এর দ্বারা দশটি কারণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যে সত্তার মধ্যে এ সমস্ত অসাধারণ গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে, মানুষ তাকে দেখামাত্রই বুঝতে পারে এবং মেনে নিতে বাধ্য হয়, এ পবিত্র সত্তা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও নির্বাচিত একটি সত্তা। আল্লাহ তাআলা তাকে বিশেষ ও অসাধারণ গুণাবলিসমেত সৃষ্টি করেছেন। অবয়ব-আকৃতিতে যদিও সাধারণ মানুষ মনে হয়, কিন্তু স্বভাবপ্রকৃতি ও আচারবিধিতে ছিলেন মানুষের চেয়ে অনন্য। হাদিসে এসেছে,আম্বিয়া কিরামের পবিত্র শরীর মুবারক জান্নাতের রুহের অনুরূপ করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সপ্তম কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মুসতাজাবুত দুআ' ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যখন যে দুআ করতেন তাই কবুল করা হতো। কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কোনো শব্দ, দুআ বা বদদুআ বের হলে তেমনই ঘটত, এতে সামান্যমত হেরফের হতো না। দুশমনরা কখনো তাঁর থেকে কোনো বদদুআ শুনতে পেলে ঘাবড়ে উঠত এবং নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নিত, মুহাম্মাদ যা বলেছে তাই ঘটবে। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. এ ধরনের মুজিজার জন্য *খাসাইসুল কুবরা* গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন।[১০২]

অষ্টম কারণ, গাছপালা ও জড়-পাথর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবি হওয়ার সংবাদ দিয়ে তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের সাক্ষী হয়েছে। একবার রাসুল

---

১০১ *খাসাইসুল কুবরা*, ১/১১৬। এই বর্ণনার কোনো সনদ নেই। তা ছাড়া ইমাম সুয়ুতি ইমাম বাইহাকির উদ্ধৃতি দিয়ে আরও একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাও দুর্বল। *দালাইলুন নবুওয়া*, ১/২৯৮। সহিহ বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেবারে খাটো বা খুব দীর্ঘাকৃতির ছিলেন না। *সহিহ বুখারি*, ৩৫৪৯। *সহিহ মুসলিম*, ২৩৩৭। তবে মজলিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্যদের চেয়ে উঁচু দেখতে পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, মজলিসের মধ্যমণিকে সাধারণত উঁচুই দেখা যায়। এ ছাড়াও সাহাবিগণ নবিজির মজলিসে বিনয়ের সাথে বসতেন। যদ্দরুণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উঁচু দেখানোটা খুব স্বাভাবিক।

১০২ *খাসাইসুল কুবরার* উদ্ধৃতিতে বর্ণিত বর্ণনাদির বিশ্লেষণ থেকে ইতিমধ্যে এতটুকু উপলব্ধি হয়েছে যে, এই গ্রন্থটির সকল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এই গ্রন্থের কোনো বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত কি না তা যাচাই করে নেওয়া জরুরি।—সম্পাদক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছকে আসতে হুকুম করলে তাঁর নিকটে এসে আবার যথাস্থানে ফিরে যায়।

নবম কারণ, অনেক পণ্ডিত, ধর্মযাজক ও গণক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবি হওয়ার খবর দিয়েছেন এবং তারা স্বীকার করেছেন, তিনি শেষ জামানার প্রেরিত নবি, তার আনুগত্যেই রয়েছে পরকালের মুক্তি।

দশম কারণ, একাধিক বার বিভিন্ন জীবজন্তু থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে। গাছপালা, পাথর, জড়পদার্থ এবং জীবজন্তু থেকে প্রকাশিত হওয়া নবুয়তের সাক্ষ্যগুলো ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. *খাসাইসুল কুবরা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

নবুয়তের নিদর্শনসমূহ

বনি ইসরাইলের আলিমদের নিকট সর্বস্বীকৃত ছিল, শেষ জামানায় একজন নবির আগমন ঘটবে। তাঁর আনীত দ্বীন সমস্ত ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ হবে এবং তা আগেকার সকল ধর্মকে রহিত করে দেবে। এ সমস্ত বিষয়াবলি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত দাবি করার অকাট্য প্রমাণ ছিল। এবং আহলে কিতাবরা তা খুব ভালোভাবেই জানত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে তারা তাঁর সুসংবাদ দিত, কিন্তু যখন তিনি নবুয়তের দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তারাই তার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। অথচ তারা পূর্ব থেকে সুসংবাদ দিয়ে আসছিল, শেষ জামানার নবি আহমাদের আগমনকাল খুব আসন্ন ও সন্নিকটে।

এমনইভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের নিকটবর্তী সময়ে বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনাবলি প্রকাশিত হয়েছে। যেমন আবাবিল পাখির প্রস্তরাঘাতে হস্তিবাহিনী ধ্বংস হওয়া, পৃথিবীর সব মূর্তি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া, শ্বেতসমুদ্রের পানি হঠাৎ শুকিয়ে যাওয়া, পারস্যসম্রাট কিসরার প্রাসাদ থেকে চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙে পড়া এবং গণকদের একমত হওয়া, অচিরেই পৃথিবীতে এক বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হবে ও জিনদের আসমানের খবর শোনা বন্ধ হয়ে

যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি আলামত প্রকাশিত হওয়া এগুলোর সবকটিই নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ বহন করে।

যে-সকল মুজিজা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়তের দাবি করার পরে প্রকাশিত হয়েছে তা অগণিত-অসংখ্য। যেমন চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, গাছ ও পাথরের সালাম দেওয়া, পাথরখণ্ডের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাত মুবারকে তাসবিহ পাঠ করা, আঙুল মুবারক থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়ে একদল সৈন্যবাহিনী তা পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে যাওয়া, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের কান্না করা ও তা উপস্থিত সকলের শ্রবণ করা এবং তাঁর দুআর বরকতে সামান্য কয়েকজনের খাবার একটি বড় দলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেক প্রকারের মুজিজা হলো ভবিষ্যদবাণী, অর্থাৎ অমুক সময় এমন এমন কাজ সংঘটিত হবে এবং তা বাস্তবেও সেভাবেই ঘটেছে, যেমন তিনি মক্কা, ইয়ামান, শাম ও ইরাক বিজয়ের সংবাদ দিয়েছেন এবং তা এ ধারাবাহিকতায়ই বিজয় হয়েছে।[১০৩]

কুরআনের মুজিজা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব থেকে বড় মুজিজা আল্লাহ তাআলার অবিনশ্বর চিরন্তন কালাম তথা কুরআন কারিম। যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। অন্য সকল নবির মুজিজাসমূহ তাদের সাথে সাথে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ মুজিজা তথা কুরআন মাজিদ এখন পর্যন্ত আগের মতোই বিদ্যমান রয়েছে। পৃথিবী যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিজা ও নবুয়ত স্বচক্ষে সর্বক্ষণ অবলোকন করছে। কুরআন কারিম আল্লাহ তাআলার কালাম হওয়ার প্রমাণ স্বয়ং কুরআন নিজেই। কেননা কুরআন চৌদ্দশ বছর আগে থেকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে, যদি তোমরা আমাকে আল্লাহর কালাম হওয়ার বিষয়টিতে দ্বিধাবোধ করে থাকো এবং একে মুহাম্মাদের কালাম মনে করো, তাহলে কুরআনের ছোট থেকে ছোট সুরার অনুরূপ অন্তত একটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো। কিন্তু শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করতে পারেনি। অথচ কুরআন ওই একই শব্দ,

---

১০৩ উপরিউক্ত মুজিজাসমূহ সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। সনদে কমবেশি দুর্বলতা থাকলেও আলেমগণ এসব বর্ণনা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন।

একই অক্ষর ও একই বাক্য দ্বারা গঠিত, যা আরবের বয়োবৃদ্ধ ও ছোট-বড় সকলেরই জানা এবং সকলে এই ভাষা দ্বারাই নিজেদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে থাকে। কিন্তু আজ অবধি জগদবিখ্যাত কোনো কবি-সাহিত্যিক বা আলংকারিক কুরআনের ছোট থেকে ছোট একটি সুরার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। আসল গোলাপ ও কাগজের গোলাপের মধ্যে পার্থক্য করতে যেমন সবাই পারে এবং সকলেই জানে আসল গোলাপ কেউ বানাতে পারে না। পক্ষান্তরে কাগজের গোলাপ সকলেই বানাতে পারে, তেমনই আল্লাহ তাআলার কালাম ও মানুষের কথার মাঝে পার্থক্য হলো, কেউ আল্লাহ তাআলার কালামের অনুরূপ দৃষ্টান্ত আনতে সক্ষম নয়। কুদরতি এবং নির্মিত বস্তুর পার্থক্য সবাই করতে পারে। যে জিনিস শুধু আল্লাহ তাআলার কুদরত দ্বারা প্রকাশিত হয়ে মানুষের সাধ্যাতীত হয়ে থাকে, তাকে কুদরতি বস্তু বলে। যেমন আসমান জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা-নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং দিনরাতের আবর্তন ঘটানো ইত্যাদি। এ সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। সৃষ্টিজীবের শক্তিসামর্থ্যের বাইরে এবং কোনো সৃষ্টিজীবই এ ধরনের বস্তু সৃষ্টি করতে এবং এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম নয়। যে বস্তু বান্দা বানাতে সক্ষম এবং বানানোর ক্ষমতা রাখে তাকে নির্মিত বস্তু বলে। যেমন ঘরদোর বানানো ইত্যাদি মানুষের কাজ। আর আসমান জমিন বানানো আল্লাহ তাআলার কাজ। এ কারণে হজরত ইবরাহিম আ. নমরুদের মুকাবিলা করার সময় আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের দলিল দিয়েছিলেন, আমার রব ও প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। নমরুদ এর প্রত্যুত্তরে একটি বাচ্চাসুলভ কাজের প্রস্তাব করলে তিনি জবাব দিলেন,

قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

আমার রব পূর্ব থেকে সূর্য উদিত করেন, সুতরাং তুমিও যদি রব হয়ে থাকো এবং আমার রবের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার দাবি করো, তাহলে সূর্যকে পূর্ব থেকে ব্যতিরেকে পশ্চিম থেকে উদিত করে দেখাও।[১০৪]

---

১০৪ (সুরা বাকারা, ২৫৮)

এ উত্তর শুনে কাফির নমরুদ বেচারা লা-জওয়াব ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে। হজরত ইবরাহিম আ.-এর উক্ত উত্তরের মূল সারাংশ হলো, কুদরতি কাজকর্মে আল্লাহ তাআলার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ হতে পারে না।

সুতরাং যেমনইভাবে আল্লাহ তাআলার কাজ ও সৃষ্টিজীবের কাজের মাঝে পার্থক্য সাধিত হয়ে থাকে, তেমনই আল্লাহ তাআলার কালাম ও মানুষের কালামের মাঝে তফাত সাধিত হবে। কেননা কেউ আল্লাহ তাআলার কালামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম নয়।

কুরআন কারিম কীভাবে নবুয়তের দলিল হলো?

অকাট্যভাবে যখন প্রমাণিত কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম, তখন এটাও স্বীকৃত হয়ে গেল, এ কুরআন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাজিল হয়েছে। এর দ্বারা এও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়, তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য নবি। কারণ যার ওপর আল্লাহ তাআলার কালাম ও কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নবি ও রাসুল। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, কুরআন কারিম একসাথে ইলমে নবুয়ত তথা নবুয়তের জ্ঞান ও নবুয়তের দলিল উভয়টিই হতে পারে। অর্থাৎ কুরআন একাই নবুয়তের দাবিদার এবং নবুয়তের দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আল্লাহ তাআলা যাকে নবি হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর জন্য আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে এ দাবির প্রমাণস্বরূপ মুজিজাকে দলিল হিসেবে দান করবেন এটাই স্বাভাবিক। যেন দাওয়াত এবং দলিল দুটি পৃথক পৃথক ছিল, কিন্তু আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দাওয়াত ও দলিলকে কুরআন কারিমে একত্র করে দান করা হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে কুরআন দাওয়াত আর ফাসাহাত ও বালাগাত তথা সাহিত্যালংকারের দিক দিয়ে মুজিজা এবং নবুয়তের দলিল ও দাওয়াতের জন্য প্রমাণস্বরূপ। কুরআন কারিমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে দাওয়াত, দলিল-প্রমাণ ও দাবি এ সবই বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয় কিয়ামত পর্যন্ত একে অন্যের থেকে আলাদা ও পৃথক হবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপাদমস্তক তথা তাঁর বিবেকবুদ্ধির পরিপূর্ণতা, চরিত্রমাধুরী, পূতঃপবিত্র স্বভাব, পছন্দনীয় অভ্যাস ও পবিত্র সত্তার শুভ্রতা নিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে যে-কেউ নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে, তিনি নিজেই একটি মুজিজা এবং আল্লাহ তাআলার এক মহৎ নিদর্শন ছিলেন।

কেননা একজন উম্মি ব্যক্তির জন্য শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করা ব্যতিরেকে ইলম ও হিকমতের ঝরনাধারা হওয়া, উৎকৃষ্ট চরিত্রাবলির ভান্ডার তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকা এবং উত্তম কার্যাবলির পথপ্রদর্শক হওয়া, যা হাজার বছর ধরে সভ্যতা ও শিষ্টাচারের সমুদ্রে অবগাহন করেও অর্জন করা সম্ভব নয়। কাজেই এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আমানত ও দ্বীনদারি দুনিয়াবিমুখতা ও খোদাভীতি এবং বেনজির ইবাদতগুজার হওয়া এ সবকিছু আল্লাহ তাআলার অলৌকিক পরিচর্যার এমন বিস্ময়কর কারিশমা, যা অনুধাবন করতে দলিল-প্রমাণ ও দস্তাবেজ একত্র করা অপ্রয়োজনীয়। এ কারণেই তাঁর পবিত্র চরিত্রমাধুরী ও বিবেকবুদ্ধির পরিপূর্ণতা এবং নিষ্কলুষ সত্তা স্বয়ং একটি মুজিজা। কুরআন কারিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্ঞানগত মুজিজা আর চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, গাছ ও পাথরের সালাম দেওয়া এবং পবিত্র আঙুল মুবারক থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো কর্মগত মুজিজা নামে অভিহিত।

নবুয়ত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং ফেরেশতাদের অস্তিত্বের আকিদা

এখন আমরা নবুয়তের অধ্যায় শেষ করব। এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণ করণার্থে সংক্ষিপ্তভাবে ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। কেননা নবুয়ত ও রিসালাতের ভিত্তিমূল হলো আসমানি ওহি। আর ওহি অবতীর্ণ হয় ফেরেশতাদের মাধ্যমে। কাজেই সংক্ষিপ্তভাবে ফেরেশতাদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু আকিদার আলোচনা পেশ করা যুক্তিসংগত মনে করছি।

প্রথমেই জানা উচিত, ফেরেশতাদের ওপর ইমান আনয়ন করা ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন কারিমে জায়গায় জায়গায় আল্লাহ তাআলার ওপর ইমান আনার পরে ফেরেশতাদের ওপর ইমান আনার আলোচনা করা হয়েছে।

অধিকাংশ ইমামের নিকট ফেরেশতারা সূক্ষ্ম অথবা নুরানি শরীরবিশিষ্ট জীব, তারা পুরুষও নন মহিলাও নন। তাদেরকে কঠিনতম কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তারা সব ধরনের আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন। পানাহার করা ও এর দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি তথা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, পেশাব-পায়খানা এবং জন্মদান করা এ সবগুলো গুণাবলি থেকে তারা পবিত্র। বরং মানবীয় গুণাবলি যথা, রাগ, হিংসা, অহংকার এবং লোভ-লালসা থেকেও তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাসবিহ-তাহলিলে মগ্ন থাকে। কখনো ক্লান্তিও বোধ করে না এবং বিরক্তও হয় না। কুরআন বলে,

يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

> দিবাযামী তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় নিমগ্ন থাকে এবং তারা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয় না।[১০৫]

এবং আল্লাহ তাআলার কোনো আদেশ সামান্য পরিমাণও অমান্য করে না। কুরআন বলে,

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

> আল্লাহ তাআলা তাদের যে আদেশ করেছেন, তারা তা অমান্য করে না এবং তাদের যা আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা কেবল তাই সমাধা করে। [১০৬]

---

১০৫ (সুরা হা-মিম সাজদা, ৩৮)

১০৬ (সুরা তাহরিম, ৬)

ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রামাণ্যতা

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনাভিত্তিক দলিল উভয় দ্বারাই প্রমাণিত। যৌক্তিক দলিল, পৃথিবীর নিম্ন ও ঊর্ধ্ব স্তর নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, কায়েনাতের একটি বিশেষ জীবশ্রেণি রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তর জড়-পদার্থের। এরপরে বৃক্ষ-তরুলতার, তারপর জীবজন্তুর, অতঃপর মানুষের স্তর। কারণ অন্য সমস্ত জগৎ থেকে মনুষ্যজগৎ অনুভূতি ও জ্ঞানগরিমায় উন্নততর। মনুষ্যজগৎ অন্য সমস্ত প্রাণিকুল থেকে শ্রেষ্ঠ ও অনন্য হওয়ার কারণে তাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয়। কিন্তু বিবেক এর সাথে সাথে এই স্বীকৃতিও দেয়, মানুষের জ্ঞানগরিমার পরিধি ও শক্তিসামর্থ্যের সীমানা সামান্য পরিমণ্ডলে বিস্তৃত। কাজেই এমন একটি সৃষ্টিজীব থাকা আবশ্যক, যারা শক্তিসামর্থ্যে ও জ্ঞানগরিমায় সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হবে। আর তারাই হলেন ফেরেশতা, যাদের খাদ্য তাসবিহ ও তাহলিল।

কখনো কখনো এই দুর্বল শরীরের মানুষ যখন ফেরেশতাদের মতো আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য করে তাঁর পথে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়, তখন তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হয়। হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

> আমার চাচাতো ভাই জাফর ইবনু আবি তালিবকে আমি জান্নাতে দুই পাখা দিয়ে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।[১০৭]

কুরআনে এসেছে,

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো।[১০৮]

এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে, চার্লস ডারউইনের নিকট যদি মানুষ উন্নততর তথা বিবর্তন হতে হতে বানর থেকে মনুষ্যজগতে পদোন্নতি করতে পারে, তাহলে সেই

---

১০৭ *সুনানু তিরমিজি*, ৩৭৬৩। হাসান গরিব।

১০৮ (সুরা ফাজর, ২৯)

মানুষই মনুষ্যজগৎ থেকে আগে বেড়ে ফেরেশতাজগতে পদোন্নতি করতে সক্ষম নয়?

বর্ণনাভিত্তিক দলিল

এ দলিলের ভিত্তি হজরত আম্বিয়া কিরামের স্বচক্ষে অবলোকন এবং হজরত আউলিয়া কিরামের কাশফ। অর্থাৎ হজরত আম্বিয়া কিরাম আ. স্বচক্ষে এবং হজরত আউলিয়া কিরাম কাশফের মাধ্যমে ফেরেশতাদের দেখেছেন। সত্যবাদী ও পবিত্র মানুষদের থেকে কোনো বস্তু দেখা ও কাশফ দ্বারা বর্ণিত হওয়া উক্ত বস্তু বিদ্যমান ও অস্তিত্বশীল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ বহন করে। কোনো বস্তুকে শুধু দৃষ্টিগোচর না হওয়ার কারণে তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা সমস্ত বিবেকবানের নিকট সুস্পষ্ট ভুল নীতি। আদালতে দৃষ্টিমান ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য আর অন্ধ ব্যক্তির অস্বীকৃতি শ্রবণযোগ্য নয়?

ফেরেশতা অস্তিত্বশীল হওয়া নিয়ে দার্শনিকদের সংশয় এবং আমাদের উত্তর

বর্তমান দার্শনিকেরা যেহেতু ফেরেশতার অস্তিত্ব রয়েছে বলে স্বীকার করে না, তাই আমরা এখানে তাদের বিভিন্ন সংশয় ও ইসলামি গবেষক আলিমদের বক্তব্য পাঠকদের সামনে পেশ করব।

প্রথম সংশয়

বর্তমানের দার্শনিকেরা বলে, যদি ফেরেশতা বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকত, তাহলে অবশ্যই তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হতো।

উত্তর

এক. ফেরেশতা সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কাচের স্বচ্ছ বোতলে নির্মল বায়ু ভরে রাখলে তা সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না। দৃষ্টিগোচর হয় না, এজন্য কি আজ অবধি কোনো দার্শনিক বায়ুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে?

দুই. অনেক বাষ্পীয় পদার্থ এমন রয়েছে, যা যন্ত্রাদি দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। কাজেই এমন জিনিস হওয়া সম্ভব, যার বাস্তবে অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু আমাদের নিকট উক্ত বস্তু দর্শন করার যন্ত্র না থাকার কারণে দেখতে পারি না।

তিন. খাবার ইত্যাদির মধ্যে বিষ দেওয়া হলে সাধারণত তা স্বল্প হওয়ার দরুন মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি থেকে বহির্ভূত হওয়ার কারণে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বানর তাতে ঘ্রাণ নেওয়া মাত্রই বুঝতে পারে এতে বিষ রয়েছে। আর বেজি বা নেউল তো দেখা মাত্রই চিনতে পারে এতে বিষ আছে।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কিছু বস্তু বোঝার ও অনুধাবন করার শক্তি আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান করেননি। অথচ নিম্নশ্রেণির কোনো সৃষ্টিজীবকে তা দেখার ও অনুধাবন করার শক্তি দান করেছেন। তাহলে কি এটা সম্ভব নয়, ফেরেশতাদের অবলোকন করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা শুধু হজরত আম্বিয়া কিরামকেই দান করেছেন, অন্য সাধারণ মানুষকে ফেরেশতাদের অবলোকন করার শক্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন?

বরং হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, কিছু প্রাণীকে প্রখর দৃষ্টি ও অনুভূতিশক্তি দান করা হয়েছে, যা মানুষকে দেওয়া হয়নি। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ، فَسَلُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا

যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পাবে তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ চাইবে; কেননা মোরগ একজন ফিরিশতাকে দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার চিৎকার শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। কেননা সে একটা শয়তানকে দেখেছে।[১০৯]

অর্থাৎ মোরগ ফেরেশতা দেখে ডাকে। গাধা শয়তান দেখে ডাক দেয়। কিন্তু মানুষ তাদের দেখতে পায় না, এই শক্তি তাদের দেওয়া হয়নি। মৌমাছি কখনো নিজের পথ ভুলে বিপথে যায় না, কিন্তু মানুষকে এমন স্মরণশক্তি দান করা হয়নি। পিঁপড়া গর্তের মধ্যে থেকেই মিষ্টির ঘ্রাণ পেয়ে যায়, অথচ মানুষকে এমন ঘ্রাণশক্তি দেওয়া হয়নি।

---

১০৯ সুনানে আবু দাউদ৫১০২-

বানর এবং জমিনের অনেক কীটপতঙ্গ অন্ধকার ও আলোয় একইরকম দেখে। বেতার ও রেডিয়োর মাধ্যমে হাজার হাজার মাইল দূরের সংবাদ ও আওয়াজ শ্রবণ করা যায়, যা বেতার ও রেডিয়ো ব্যতীত শ্রবণ করা সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তির নিকট যদি রেডিয়ো না থাকে, অথচ সে দূরের সংবাদ শ্রবণ করা যায় একে অস্বীকার করে, তাহলে বর্তমান দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিধান প্রয়োগ হবে?

দ্বিতীয় সংশয়

ফেরেশতাদের ব্যাপারে যেসব কঠিন ও শক্তিশালী কার্যাবলি সমাধা করার উল্লেখ কুরআন-হাদিসে এসেছে, এগুলো কীভাবে সম্ভব হতে পারে? যেমন কুরআনে এসেছে, কোনো ফেরেশতা অথবা জিন চোখের পলকে সাবা সম্প্রদায়ের রানি বিলকিসের সিংহাসন হজরত সুলাইমান আ.-এর সামনে হাজির করেছিলেন। এবং ফেরেশতাদের মুহূর্তের মধ্যে জমিনে অবতরণ করা আবার আসমানে গমন করা ইত্যাদি ইত্যাদি কীভাবে সম্ভব হতে পারে।

উত্তর

ফেরেশতা একেবারেই সূক্ষ্ম ও নুরানি শরীরবিশিষ্ট জীব। সূক্ষ্ম ও নুরানি বস্তুর তেজস্ক্রিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে থাকে। আগুন, বাষ্প, বিদ্যুৎ ও পানির ক্ষমতা মানুষের চোখের সামনে বিদ্যমান রয়েছে, যা অস্বীকার করার জো নেই। এ সকল বস্তু প্রতিহত করার জন্য যদি মাটিকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এ উপাদানগুলোর সামনে মাটির কোনো অস্তিত্ব বাকি থাকবে? আপনিই বলুন, এ বস্তুগুলোর মাঝে সূক্ষ্মতা ও ঘনত্ব ব্যতিরেকে আর কী এমন পার্থক্য রয়েছে? বিদ্যুতের কারিশমাও আজ পুরো পৃথিবীর সামনে উদ্ভাসিত। কাজেই কওমে সামুদ ফেরেশতার এক চিৎকারে কলিজা ফেটে মৃত্যুবরণ করাকে তোমরা অবাস্তবিক মনে করো কেন?

বারুদকে দেখুন বাহ্যিকভাবে এটা কোনো বস্তুই মনে হয় না, কিন্তু এতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলে তা একটি পাথরের পাহাড়কে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। বাষ্প স্বীয় সূক্ষ্মতার দরুন একটি মস্ত বড় লৌহনির্মিত ভারী রেলগাড়িকে হাজার হাজার মাইল দূরে টেনে নিয়ে যায়।

আর বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বিশাল বিশাল জাহাজকে ওপরে তোলা হয়। তাহলে আল্লাহ তাআলার কোনো ফেরেশতা যদি আল্লাহ তাআলার দেওয়া শক্তিতে লুত সম্প্রদায়কে আসমানে উঠিয়ে উলটো করে নিচের দিকে নিক্ষেপ করে, তাহলে তা অস্বীকার করার জন্য তোমাদের নাভিশ্বাস ওঠে কেন? আল্লাহর কোনো ফেরেশতা যদি হজরত ঈসা আ.-কে জীবিত সশরীরে আসমানে তুলে নেয়, তোমরা একে অবাস্তব বলে জ্ঞান করো কোন মুখে?

তৃতীয় সংশয়

কুরআনের আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, ফেরেশতাদের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু বিবেকের মানদণ্ডে একই বস্তুর বিভিন্ন আকৃতির হওয়া যুক্তিসংগত মনে হয় না।

উত্তর

সূক্ষ্ম বস্তুর একাধিক আকৃতিতে রূপ ধারণ করা গবেষণার মাধ্যমে আজকাল প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন ইথার তরঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির হওয়া বিজ্ঞানীদের নিকট সর্বজনস্বীকৃত একটি বিষয়। কাজেই ফেরেশতাদের আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ কিয়ামত তথা আখিরাতে বিশ্বাস

কিয়ামত ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের অকাট্য ও মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত। হজরত আম্বিয়া কিরাম তাওহিদের পরে দুনিয়াবাসীকে আখিরাতজগৎ সম্পর্কে অবহিত করে বলেছেন, এক দিবসের আগমন ঘটবে, যেদিন পৃথিবীকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে। মৃত্যুর পরে মানবদেহ মৃত্তিকায় মিশে গেলে আল্লাহ তাআলা পুনরায় তা জীবিত করবেন। দ্বিতীয়বার প্রত্যেক শরীরের সাথে আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করে প্রথমে আমলের হিসাব নেবেন এবং বান্দা দুনিয়াতে যা-কিছু করেছে তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। অতঃপর কাউকে জান্নাতে এবং কাউকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। উপর্যুক্ত বিষয়ের ওপর সকল সত্য ধর্ম ও সব আসমানি ধর্মের

ঐকমত্য রয়েছে। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা জায়গায় জায়গায় বারংবার তাঁর ওপর ইমান আনার ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে আখিরাত দিবসের ওপর ইমান আনয়ন করার আলোচনা পেশ করেছেন। বরং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাগমন বিশ্বাসের ওপরই নির্ভরশীল। এ ধ্বংসশীল পৃথিবীর থেকে বিদায় গ্রহণের পর কী হবে এ প্রশ্ন উঠলে ওহিযোগে প্রত্যাদেশ হলো, এ ইহকালীন জীবনের পরে অন্য আরেকটি নতুন জীবন রয়েছে। তবে যাদের ধারণা,

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

> আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না।[১১০]

এরূপ ছিল এবং এখনো যারা এরূপ ধারণা পোষণ করে, তাদের না কোনো দ্বীন-ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে, না কিয়ামতের এবং না তাদের প্রতিদান ও শাস্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে।

ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসে এ নশ্বর ও কৃত্রিম জীবনের পরে একটি নতুন অকৃত্রিম জীবনের আগমন ঘটবে আর সেটিই মূল ও প্রকৃত জীবন। অবিনশ্বর চিরন্তন সত্তা হলেন মহামহিম একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাঁর কুদরতের সমুদ্র এবং ইরাদা ও ইচ্ছার তরঙ্গ সম্ভাব্য বিষয়কে অস্তিত্বহীনতার পর্দা থেকে বের করে এনে ইন্দ্রিয়জগতে পৌঁছে দিয়েছেন, যাকে আমরা পৃথিবী নামে চিনি। পৃথিবীর বাস্তবতা এক সময় বিদ্যমান ছিল না, আবার অবিদ্যমান হয়ে যাবে। এরপর এমন একটি দিবস আসবে, সেদিন তাঁরই ইচ্ছাসমুদ্রের একটি তরঙ্গ সবকিছুকে ধ্বংস করে মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করাবে, এর নামই হলো কিয়ামত। সেদিন সমস্তকিছু একসাথে ধ্বংসগহ্বরে নিপতিত হবে। অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইচ্ছাসমুদ্রের তৃতীয় আরেকটি ঢেউ সমস্ত জগৎকে ধ্বংস ও অনস্তিত্বের গর্ত থেকে বের করে এনে বিদ্যমানতা ও জীবনের তটে দাঁড় করিয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

---

১১০ (সুরা মুমিনুন, ৩৭)

নিশ্চয় আপনার রবের নিকটেই সবকিছুর সমাপ্তি।[১১১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

এবং সবকিছু আমার নিকটেই প্রত্যাবর্তনশীল।[১১২]

এটাকেই শরয়ি পরিভাষায় হাশর বলা হয়।

হাশর তথা পুনরুত্থান দিবস অস্বীকারকারীদের বক্তব্য

দার্শনিকেরা তো একেবারেই হাশরকে অস্বীকার করে, চাই তা শারীরিক হোক বা আত্মিক হোক, সব ধরনের হাশরকেই তারা অকপটে অস্বীকার করে।

যে-সমস্ত নাস্তিক-মুরতাদ মুখে নিজেদেরকে ইসলামের অনুসারী বলে দাবি তোলে, তারাও সশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। তবে আত্মিক জগতের পুনরুত্থানকে তারা অস্বীকার না করে বরং স্বীকার করে নেয়। তাদের মতে আখিরাত একটি আত্মিক জগতের নাম। জান্নাতের নিয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তি শুধু আত্মিক জগতের সাথে সম্পৃক্ত। শারীরিকভাবে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তারা আখিরাতসম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলোর বিভিন্ন ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ তারা যে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ দাঁড় করায়, তা পষ্ট বিকৃতি বই কিছুই নয়। কারণ দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ও অর্থবহ কোনো বক্তব্যকে ব্যাখ্যার ছাঁচে ঢালা অস্বীকৃতি ও হঠকারিতারই নামান্তর।

দার্শনিকরা বলে, মানুষ অনুভূতিশীল কায়াবিশিষ্ট বস্তুর নাম, যা চার উপাদান তথা মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু এবং বিশেষ শক্তি ও মিশ্র পদার্থের সমষ্টির নাম। মৃত্যুর পরে যা একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। যার ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত অস্থি ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না। কাজেই কোনো বস্তুই এমন থাকে না যা পুনরায় সৃষ্টি করা সম্ভব। তাহলে কি এমন বিষয়কে পুনরুত্থান অভিধায় অভিহিত করা যায়?

উক্ত বক্তব্যের উত্তর

---

১১১ (সুরা নাজম, ৪২)

১১২ (সুরা আম্বিয়া, ৯৩)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গঠনাকৃতিবিশিষ্ট মাটি থেকে সৃষ্ট শরীরের নাম মানুষ নয়। বরং মানুষ জাওহারে মুজাররাদ তথা নিরঙ্কুশ মূলবস্তুর নাম, যা জ্ঞান, বুঝ-উপলব্ধি, সামর্থ্য ও ইচ্ছাধীনতার গুণে গুণান্বিত। একে রুহ নামে ব্যক্ত করা হয়। আর এ অনুভূতিশীল কায়া ও শরীর হলো রুহের ফরমা ও পোশাকস্বরূপ। মৃত্যুবরণ করার দ্বারা শরীরের থেকে রুহ তথা আত্মার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু উক্ত মূলবস্তু তথা রুহ ধ্বংস হয়ে যায় না, বরং একটি ভিন্ন জগতে পদার্পণ করে। যদিও এ শরীর পচে-গলে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তবুও তার রুহের সাথে আত্মিকভাবে সুপ্ত সম্পর্ক বজায় থাকে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যেমনইভাবে নিজ ইচ্ছা ও ইরাদায় প্রথমবার শরীরের সাথে রুহের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন, তেমনইভাবে দ্বিতীয়বার শরীর বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় তাঁর ইচ্ছা ও ইরাদায় আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করবেন। মক্কার কাফিররা পুনরুত্থান ও দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার অস্বীকারকারী ছিল। এখনো যারা বলে, মৃত্যুর পর বিলীন হয়ে যাওয়ার পরেও পুনরায় জীবিত হওয়ার কী অর্থ হতে পারে?

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

> وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ
>
> কাফিররা বলে, যখন আমরা মরে মাটির নিচে পচে-গলে বিলীন হয়ে যাব এবং একেবারেই নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে যাব, তারপরও কি আমরা আবার নতুনভাবে জীবন লাভ করব? বরং তারা তো তাদের রবের সাক্ষাতের অস্বীকৃতি জানায়।[১১৩]

আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যুত্তরে ইরশাদ করেন,

> قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

---

১১৩ (সুরা সাজদা, ১০)

বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।[১১৪]

শাহ আবদুল কাদির রহ. লেখেন, তোমরা নিজেদেরকে শুধু দেহধারী শরীরবিশিষ্ট অবয়ব মনে করেছ, যে মৃত্যু হলেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। বাস্তবে তোমরা হলে রুহ তথা আত্মা, যা ফেরেশতা নিয়ে যায় এবং তা কখনোই ধ্বংস হবে না।[১১৫]

অর্থাৎ মৃত্যু ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার নাম নয়, বরং শরীর থেকে রুহ আলাদা ও পৃথক হওয়ার নাম মৃত্যু। আর রুহ শরীরের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার নাম জীবন।

দ্বিতীয় উত্তর

দার্শনিকদের ধারণা অনুযায়ী যদি মেনেও নেওয়া হয়, বাহ্যিক গঠনাকৃতি ও খোলসের নাম মানুষ, যা এক ধরনের বিশেষ শক্তি ও মিশ্র পদার্থের থেকে সৃষ্ট, তবুও আমাদের দাবিই প্রমাণিত হয়। কেননা যে আল্লাহ তাআলা প্রথমবার নিজ কুদরতে মৌল পদার্থের মৌলিক উপাদানসমূহকে সংযুক্ত ও বিন্যস্ত করে এক বিশেষ শক্তি ও উন্নত প্রকৃতির সংমিশ্রণে একটি অনুভূতিশীল অবয়ব বা আকৃতি সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তেমনই দ্বিতীয়বারও তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। উক্ত অনুভূতিশীল অবয়ব ও আকৃতি প্রথমে যেমন সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল, তেমনই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তাআলার কুদরত, তাঁর ইচ্ছা-ইরাদা ও শান-শওকত চিরন্তন এবং তা কোনোকিছুকেই পরোয়া করে না। তাহলে এমন সত্তার নিকটে কোনো বস্তু অসম্ভব হওয়ার কী অর্থ হতে পারে? পরিশেষে আমাদের কেউ বলে দিক, এমন সত্তার ব্যাপারে অসম্ভব হওয়ার ধারণা তোমাদের মস্তিষ্কের কোন গলি দিয়ে প্রবেশ করল! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

১১৪ (সুরা সাজদা, ১১)

১১৫ *মুযিহুল কুরআন*, উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাগবিতণ্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে-গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।[১১৬]

বীর্য মানুষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সারনির্যাস। এবং তা শরীরে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। মানুষের ওপর যখন জৈবিক চাহিদার তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, তখন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সবেগে স্খলিত পানি তথা বিন্দু আকৃতির শুক্রাণু বা বীর্য শরীর থেকে নির্গত হয়ে রেহেম তথা বাচ্চাদানিতে স্থিতি লাভ করে। অতঃপর এ বীর্য থেকে অন্য আরেকটি মানুষ জন্ম নেয়। শুক্রাণুর মাথার অংশ থেকে মাথা, চোখের অংশ থেকে চোখ, কানের অংশ থেকে কান এভাবে অন্যান্য অংশ থেকে অন্যান্য অংশ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং যেমনইভাবে মহামহিম পবিত্রময় আল্লাহ তাআলা নিজ সুনিপুণ পরিপূর্ণ কুদরতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একত্র করে বীর্য সৃষ্টি করেন, অতঃপর বীর্যের সামষ্টিক অংশসমূহকে বিভক্ত করে মাথার অংশ থেকে মাথা, পায়ের অংশ থেকে পা সৃষ্টি করেন, তেমনই অসীম শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পরে মানুষের মাটিতে মিশে যাওয়া বিক্ষিপ্ত অস্থি দ্বিতীয়বার একত্র করে তাতে পূর্বের ন্যায় পুনরায় প্রাণ সঞ্চার, জ্ঞান ও বোধবুদ্ধি ফিরিয়ে দিতে এবং প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যথাস্থানে স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। মোদ্দা কথা, কিয়ামতের সারমর্ম একত্র করা এবং আলাদা করা। কাজেই যেমনইভাবে বীর্যে একত্র ও বিক্ষিপ্ততা সাধন করা সম্ভব, তেমনই মৃত্যুর পরে শরীরকেও একত্র করা ও আলাদা করা ঢের সম্ভব।

---

১১৬ (সুরা ইয়াসিন, ৭৭-৭৯)

হাশরের আরও একটি দৃষ্টান্ত

যদি কোনো বস্তুর বীজ ও শস্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়, তাহলে প্রতীয়মান হয় উক্ত বীজই গাছের বিভিন্ন অংশের সারাংশ এবং সমষ্টি।

পুনরায় জীবিত করার ধরন, অর্থাৎ পুনরুত্থান কীভাবে হবে?

দ্বিতীয়বার কীভাবে জীবিত করা হবে এর ধরন ও প্রকৃতি, অর্থাৎ দেহ ও শরীর সবকিছু একেবারে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার নতুন আঙ্গিকে অস্তিত্ব দান করা হবে, নাকি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উক্ত অংশগুলোকে শুধু একত্র ও সংযুক্ত করা হবে এ নিয়ে উলামায়ে কিরাম মতানৈক্য করেছেন। কিছুসংখ্যক আলিমের মতে, মৃত্যুর কিছুদিন পরে সমস্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন সমস্ত বস্তুকে নতুন আঙ্গিকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করা হবে। আর কিছু আলিমের বক্তব্য, মৃত্যুর পরে মানবশরীরের সব অংশ নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে যায় না, বরং তা বিক্ষিপ্ত ও পৃথক পৃথক হয়ে যায়। হাশরের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত অঙ্গ ও অংশকে একত্র করে পূর্বের ন্যায় তাকে প্রথম আকৃতি, প্রথম অবস্থা ও প্রথম ধরনের অনুরূপ করে সৃষ্টি করবেন।

হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, মানুষের শরীরের অল্প কিছু অংশ তথা মেরুদণ্ডের হাড় ব্যতীত অধিকাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়। মেরুদণ্ডের হাড় মানবদেহের মূল অংশ হওয়ার কারণে অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং তা বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে পুনরায় একত্র করা হবে আর শরীরের অতিরিক্ত অংশগুলো ধ্বংস হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর এগুলোকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করা হবে। যেমন *বুখারি* ও *মুসলিম*-এ এসেছে,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ

আদমসন্তানের সবকিছুই মাটি খেয়ে ফেলবে। কেবল মেরুদণ্ডের হাড় বাকি থাকবে। এর থেকেই মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর থেকেই আবার তাদেরকে জোড়া লাগানো হবে।[১১৭]

১১৭ *সহিহ মুসলিম*, ২৯৫৫। *সহিহ বুখারি*, ৪৯৩৫। *বুখারির* শব্দ ও বাক্য ভিন্ন।

কিয়ামতের দিন উক্ত মৌলিক অংশের সাথে অন্য অংশসমূহকে মিলিয়ে কঙ্কাল বা মূল কাঠামো সৃষ্টি করা হবে। বিদগ্ধ গবেষক আলিমদের মতে, পুনরুত্থান ও দ্বিতীয়বার জীবন দান করা একটি অকাট্য বিষয়, যা অসংখ্য আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এর ধরন ও প্রকৃতি অর্থাৎ কীভাবে জীবিত করা হবে তা অকাট্য নয়, বরং ধারণাভিত্তিক। পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন উভয়ভাবেই সম্ভব, চাই তা অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করে করা হোক অথবা বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে একত্র করে করা হোক, উভয়ভাবেই সম্ভব। শরিয়ার কোনো নস তথা দলিল পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের উভয় ধরন ও প্রকৃতির কোনো একটিকে নির্ধারণ করে দেয়নি। পুনরুত্থিত হওয়ার ধরন ও প্রকৃতির ব্যাপারে যে-সমস্ত দলিল-প্রমাণ উল্লেখিত হয়েছে, এর সবগুলোই ধারণানির্ভর এবং অকাট্য নয়।

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, আমার নিকট সঠিক মত বলে ধারণা হয়, পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন উভয় পদ্ধতিতেই একসাথে হবে। শরীরের যে-সমস্ত অংশ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তা পুনরায় সৃষ্টি করা হবে আর যা বিক্ষিপ্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তা পুনরায় একত্র করা হবে।[১১৮]

এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য *শরহে আকাইদ* কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ *নিবরাস* পাঠ করা যেতে পারে।[১১৯]

হাশর তথা পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোকপাত ওপরে করা হয়েছে। আরও সুবিস্তর জানার জন্য অধম লেখকের রচিত বই 'ইলমুল কালাম' দেখা যেতে পারে। এ বইয়ে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রুহের আলোচনা

পুনরায় জীবিত হওয়ার আকিদা যেহেতু সমস্ত আকিদার মূল আর পুনর্জীবন সম্বন্ধে অবগত হওয়া রুহের আসল প্রকৃতি ও স্বরূপ জানার ওপর নির্ভরশীল, এজন্য এখানে রুহ নিয়ে আলোচনা করা উপযুক্ত মনে করছি। নিম্নে রুহ সম্পর্কে দার্শনিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও উলামায়ে ইসলামের বক্তব্য উল্লেখ করা হলো।

---

১১৮ *আল-মুসামারাহ ফি শরহিল মুসায়ারাহ*, ১০৬, ১০৭। মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ, মিশর।

১১৯ *আন-নিবরাস*, ৪৪৭-৪৫৬। মাকতাবাতু ইয়াসিন, তুরস্ক।

দার্শনিকদের বক্তব্য

রুহ একটি মৌল পদার্থ বা মূলবস্তুর নাম, যা মানুষের শরীর পরিচালনা করে থাকে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মন্তব্য

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের নিকট খাদ্য দ্বারা সৃষ্ট এক ধরনের বাষ্পীয় পদার্থের নাম রুহ। এ মতের দ্বারা বোঝা যায়, রুহ একটি শরীরবিশিষ্ট মূল উপাদান। কেননা বাষ্পীয় পদার্থ শরীরবিশিষ্ট উপাদান হয়ে থাকে, যা চারটি মৌলিক তথা (মাটি, পানি, আগুন, বাতাস) উপাদানের সারনির্যাস থেকে সৃষ্ট।

ইসলামি গবেষকদের সিদ্ধান্ত

উলামায়ে ইসলাম এ বিষয়ে সকলেই একমত, রুহ একটি ধ্বংসশীল অস্থায়ী বস্তু। চিরন্তন বা চিরস্থায়ী কোনো বস্তু নয়। কিন্তু এর বাস্তবতা ও মূল প্রকৃতি এবং আসল স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গেলে হয়রান ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়তে হয়। একদল সম্মানিত আলেম রুহের স্বরূপ উন্মোচন করতে বিরত থেকে বলেন, বান্দা রুহের রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আদেষ্টিত নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্যও পাওয়া যায় না। কাজেই এ বিষয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণা করে কোনো বিধান আবিষ্কার বা উদ্ঘাটন করাও বেকার।

কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে, রুহ সূক্ষ্ম অথবা নুরানি বা আলোকময় শরীরবিশিষ্ট একটি বস্তুর নাম, যা শরীরে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যেমন আগুন কয়লাতে এবং পানি গোলাপের পাপড়িতে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। উক্ত সূক্ষ্ম শরীর ঘন শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার নাম জীবন আর তা থেকে আলাদা হওয়ার নাম মৃত্যু। প্রসিদ্ধ অধিকাংশ কালামশাস্ত্রবিদ ও হাদিসবিশারদের মতেও রুহ একটি সূক্ষ্ম অথবা নুরানি বা জ্যোতির্ময় শরীরবিশিষ্ট বস্তু যা মূল উপাদান তথা (মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস) থেকে পবিত্র। হজরত শাহ আবদুল কাদির রহ.-ও এ মত পেশ করে সুরা সাজদার তাফসিরে বলেন, মানুষের রুহ গাইব অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে এসেছে, মাটি বা পানি থেকে সৃষ্ট নয়। বরং রুহ অতিশয় সূক্ষ্ম বা নুরানি একটি শরীর, যাকে মানবদেহে

প্রবিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু তা দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ্ তাআলার যখন ইচ্ছা হবে তখন তিনি রুহ অবলোকন করাবেন।

হজরত আবু হুরাইরা ও উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, অন্তিম সময়ে মানুষের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ম হয়ে যায়। মানুষ তখন নজর উঠিয়ে তাকিয়ে থাকে। আর তার চোখ রুহ ও আত্মা দেখতে থাকে। কালামশাস্ত্রবিদেরা বলেন, শরিয়ার বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রুহ একটি সূক্ষ্ম নুরানি শরীরবিশিষ্ট বস্তুর নাম। তবে তা শরীরবিশিষ্ট মৌলিক উপাদান থেকে সৃষ্ট কোনো বস্তু নয়। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু দলিল পেশ করা হলো।

এক. আল্লাহ্ তাআলা সুরা সাজদায় ইরশাদ করেন,

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ

> অতঃপর তিনি তাকে সুনিপুণ করে সৃষ্টি করে তার শরীরে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। ১২০

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রুহ একটি ফুঁকে দেওয়া হয়েছে এমন বস্তু। আর ফুঁকে দেওয়া বস্তুর জন্য যৌক্তিকভাবে জিসম তথা শরীর হওয়া আবশ্যক। কেননা, وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ—আয়াতটিতে এর আগের অংশ, অর্থাৎ ثُمَّ سَوَّاهُ-এর ওপর আতফ তথা সংযোজিত হয়েছে। আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র অনুযায়ী সংযোজিত বাক্য এবং যার সাথে সংযোজন করা হয়, উক্ত বাক্যের বিধান ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। এ কারণেই বোঝা যায়, এ ফুঁকে দেওয়া শরীর উক্ত মাংসপূর্ণ শরীরের থেকে আলাদা বস্তু।

দুই. আল্লাহ্ তাআলা সুরা মুমিনুনে মানুষের জন্মের সাতটি ধাপ বর্ণনা করেছেন, এর মধ্য হতে ছটি শারীরিক গঠনপ্রণালি নিয়ে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

---

১২০ (সুরা সাজদা, ৯)

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

> আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।[১২১]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রুহ আলাকা, মুজগাবা ও অন্যগুলো থেকে ভিন্ন একটি বস্তু। এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে, আলাকা ও মুজগাবা শরীরবিশিষ্ট উপাদান, সুতরাং তাহলে আবশ্যকভাবে রুহ শরীরবিশিষ্ট, তবে তা মূল উপাদান থেকে সৃষ্ট নয় প্রমাণিত হয়। কেননা যদি রুহ শরীরবিশিষ্ট মূল উপাদানের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে তা আলাকা ও মুজগাবার প্রকার ও শ্রেণিভুক্তই হতো, অন্য আরেকটি প্রকার হতো না। একে আলাদা করে উল্লেখ করারও কোনো বিশেষত্ব থাকত না। হাদিসে এসেছে,

> মুমিনের রুহ বের হয়ে গেলে ফেরেশতারা তা নিয়ে চলে যায় এবং আবার ফিরিয়ে দেয়।[১২২]

আরেক হাদিসে এসেছে,

إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ، تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ.

> মুমিনের রুহগুলো জান্নাতের সবুজ পাখির মধ্যে ঢুকিয়ে জান্নাতের গাছের সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।[১২৩]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রুহ একটি শরীরবিশিষ্ট বস্তু।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

১২১ (সুরা মুমিনুন, ১২-১৪)

১২২ *মুসনাদু আহমাদ*, ১৮৪৩৪। সহিহ। দীর্ঘ হাদিস।

১২৩ *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১৪৪৯। হাসান সহিহ।

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٤٢﴾

> আল্লাহই রুহসমূহ কবজ করে নেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদের রুহ কবজ করেন নিদ্রার সময়। সুতরাং যার ওপর তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করে দেন তা আটকে রাখেন আর অন্যটিকে ছেড়ে দেন।[১২৪]

উক্ত আয়াতে রুহ কবজ করা ও আটকে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়া উল্লেখিত হয়েছে, যা শরীরের বিশেষত্ব বোঝায়।

আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ

> আপনি যদি দেখতেন, জালিমরা যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরায় এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে, তোমাদের রুহ বের করো।[১২৫]

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রুহ কবজ করার সময় ফেরেশতারা তা নাড়াচাড়া করে এবং বের করে নেয়। এটিও জিসম ও শরীরবিশিষ্ট হওয়ার দলিল বহন করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

---

১২৪ (সুরা যুমার, ৪২)

১২৫ (সুরা আনআম, ৯৩)

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।[১২৬]

এ আয়াতে রুহের ফিরে আসা ও জান্নাতে প্রবেশ করার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। এটিও রুহ শরীরবিশিষ্ট হওয়ার দলিল বহন করে। গভীরভাবে চিন্তাফিকির করলে বোঝা যায়, মানবদেহ একটি সূক্ষ্ম ধূম্রবর্ণ বা বাষ্পীয় বস্তু, যা মৌল উপাদানচতুষ্টয়ের নির্যাস থেকে সৃষ্ট হয়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নড়াচড়া করতে উদ্বুদ্ধ করে। চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাংশ নিয়মনীতি ও বিধিনিষেধ এই বাষ্পীয় পদার্থের সাথেই সম্পৃক্ত। কেননা এই বাষ্পীয় পদার্থের ওপর ভিত্তি করেই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে মনে হয়, এই বাষ্পীয় পদার্থের নামই রুহ। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, এই ভাপ তথা বাষ্প বাস্তবিক অর্থে রুহ নয় বরং তা মূল ও প্রকৃত রুহের বাহন ও উৎস। কেননা যে রুহ চার মৌল উপাদান ও খাদ্য থেকে সৃষ্টি হয়, তাতে শৈশব থেকে নিয়ে বার্ধক্য পর্যন্ত সময়ে হাজার-লক্ষবার পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু ছেলে ও বাচ্চাটি শেষ পর্যন্ত একইভাবে অবশিষ্ট থেকে যায়, তার সত্তায় কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না, যদিও তার সিফাত তথা গুণাগুণে পরিবর্তন হয়। কাজেই যে বস্তুর কারণে ছেলে ছেলেই থাকছে, তা না বাষ্পীয় পদার্থ হতে পারে, আর না কোনো বাহ্যিক শরীর বা দেহ হতে পারে। বরং তা একটি ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু, যা এগুলো থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। আর এটিই হলো মূল ও প্রকৃত রুহ। রুহ একটি নুরানি শরীরবিশিষ্ট বস্তু যা মানুষের সাথে প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত থাকে। বাচ্চা থেকে নিয়ে যুবক, যুবক থেকে নিয়ে বৃদ্ধ পর্যন্ত একইরকমভাবে সম্পৃক্ত থাকে, কখনোই পৃথক হয় না। এই নুরানি শরীরই আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধ মান্য করার প্রতি আদেষ্টিত ও সম্বোধিত। এটিকেই সওয়াব ও আজাবের মুখোমুখি হতে হবে। ফেরেশতারা যে রুহকে বের করে রেশমি বা মোটা কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে যায়, সেটিও এই নুরানি শরীরবিশিষ্ট রুহ। এর ওপরই আলমে বরজখ তথা কবরজগতের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক বিষয়াবলি সংঘটিত হয়।[১২৭]

যে বস্তুটি দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে অনুভূতি জাগিয়ে ঐচ্ছিকভাবে নড়াচড়ার শক্তি জোগায়, তা শরীর থেকে আলাদা হওয়ার কারণে

১২৬ (সুরা ফাজর, ২৭-৩০)

১২৭ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, ১/৪৬-৪৯।

শরীরে মৃত্যু ঘটে নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এবং শরীর থেকে অনুভূতি, চেতনা ও ঐচ্ছিক নড়াচড়ার শক্তি দূর হয়ে যায়, তাকে রুহ বলে।[১২৮]

যে বাষ্পীয় শরীর মানবদেহে ধ্বংস হওয়া ব্যতিরেকে সংরক্ষিত থেকে মৃত্যুর পরও অবশিষ্ট থাকে, তাকে রুহ বলে।

এখন বাকি থাকল রুহ কী ধরনের বস্তু এবং এর বাস্তবতা ও প্রকৃত স্বরূপ কী। রুহের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে উদ্ঘাটন করা মানুষের বোধবুদ্ধি ও বুঝ-সমঝ এবং মেধাশক্তির গণ্ডির বাইরে। মানুষ স্বীয় বিবেক দ্বারা বস্তুর (চাই তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হোক বা অতীন্দ্রিয় হোক) অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং বস্তুর বিদ্যমানতার প্রমাণ পেশ করতে পারে। যেমন মানুষ বলতে পারে পানি বিদ্যমান, আগুন বিদ্যমান, কিন্তু এর হাকিকত বা প্রকৃতি বলতে পারে না। বেশি থেকে বেশি বস্তুর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন অংশের গুণাগুণ বর্ণনা করতে পারে। কিন্তু এর থেকে আগে বেড়ে উক্ত বস্তুর মূল ও আসল প্রকৃতি বর্ণনা করতে মানুষ সক্ষম নয়। মানুষ এতটুকু বলতে পারে, পানির মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন রয়েছে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় উক্ত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের হাকিকত বা বাস্তবতা কী, তখন মানুষ লা-জওয়াব হয়ে পড়ে। সুতরাং দৈনন্দিন এ সমস্ত বস্তু দেখা ও এতে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সত্ত্বেও যেমন এর মূল প্রকৃতি ও স্বরূপ বর্ণনা করতে মানুষ অক্ষম, তেমনই রুহ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা অস্তিত্বশীল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এর আসল প্রকৃতি ও মূল স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। এ কারণেই কুরআন কারিম রুহ অস্তিত্বশীল হওয়া বর্ণনা করেছে, কিন্তু এর আসল প্রকৃতি ও মূল স্বরূপ নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেনি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

তারা (কাফিররা) আপনার নিকট রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ। আর তোমাদেরকে যৎসামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।[১২৯]

---

১২৮ *তাফহিমাতে ইলাহিয়্যাহ*, ১/২৪৭ (ফার্সি)।

১২৯ (সুরা বনি ইসরাইল, ৮৫)

রুহ ধ্বংসশীল

সকল নবি ও রাসুল আলাইহিমুস সালামের শরিয়ত রুহ ধ্বংসশীল হওয়ার ব্যাপারে একমত। সকলের ঐকমত্যে, রুহ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট একটি মাখলুক। মানবদেহে প্রোথিত নুরানি জ্যোতির্ময় শরীরবিশিষ্ট একটি অদৃশ্যমান মূল বস্তুকে রুহ বলা হয়। তবে রুহ অস্তিত্বশীল বস্তু হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ তাআলার যখন ইচ্ছা হবে তখন তা দর্শনের আওতাধীন হবে। এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ.

রুহসমূহ একত্রিত সামষ্টিক সৈন্যদল।[১৩০]

আর সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, একত্রিত করা যায় এমন বস্তু কখনো অবিনশ্বর ও লয়হীন চিরন্তন বস্তু হতে পারে না। কেননা সামষ্টিকভাবে একত্রিত করা বস্তু আয়ত্তাধীন ও পরাভূত হয়ে থাকে। আর আয়ত্তাধীন ও পরাভূত বস্তু কখনোই অবিনশ্বর চিরন্তন বস্তু হতে পারে না। একত্রিত ও বিক্ষিপ্ত হওয়া ধ্বংসশীল বস্তুরই একটি গুণ। উপর্যুক্ত হাদিসটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত হাদিসবিশারদ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অন্য একটি হাদিসে এসেছে,

خَلَقَ اللّٰهُ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَلْفَيْ عَامٍ.

আল্লাহ তাআলা সমস্ত রুহকে শরীর সৃষ্টির দুহাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন।[১৩১]

এ হাদিসটিও রুহ একটি সৃষ্ট মাখলুক ও ধ্বংসশীল বস্তু হওয়ার পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়াও উক্ত হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, রুহকে মানবদেহ থেকে অনেক

---

১৩০ *সহিহ বুখারি*, ৩৩৩৬। *সহিহ মুসলিম*, ২৬৩৮।

১৩১ *তাফসিরুর রাযি*, ১৩/১৬। সুরা আনআম, ৬১-৬২-এর ব্যাখ্যায়। আল্লামা ইবনুল জাওযি এই হাদিসটিকে জাল বলে অভিহিত করেছেন। *আল-মাওযুআত*, ১/৪০১।

আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। আরও বোঝা যায়, রুহ দেহে প্রবিষ্ট একটি বস্তু। আর শরীর রুহ অবস্থান করার স্থান। দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত, যে জিনিস কোনো বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়, তা সীমাবদ্ধ ও সীমিত হয়ে থাকে। রুহ অবস্থান করার দিক দিয়ে স্থানের অনুগামী। সুতরাং যে বস্তুর শেষ রয়েছে এবং যা সীমাবদ্ধ ও অনুগামী তা ধ্বংসশীল হওয়া অনিবার্য। কেননা এ সবগুলোই ধ্বংসশীল বস্তুর গুণাবলি। প্রাচীন কালের দার্শনিকেরা রুহকে অবিনশ্বর চিরন্তন সত্তা মনে করত। তবে অধুনা যুগের দার্শনিকেরা রুহকে ধ্বংসশীল মনে করে বটে, কিন্তু তারা রুহকে শরীর ধ্বংস হওয়ার পরে ধ্বংসশীল মনে করে। অর্থাৎ তারা বলে, শরীর এবং দেহ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে যখন তা রুহ প্রবিষ্ট হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়, তখন তাতে রুহ সৃষ্টি করা হয়।

অধিকাংশ আলিমের মতে, আল্লাহ তাআলা রুহকে শরীর থেকে হাজার বছর আগে সৃষ্টি করে 'হাজিরাতুল কুদুস' নামক স্থানে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর রুহকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করার জন্য শরীর সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে অবিনশ্বর চিরন্তন সত্তার ইচ্ছামাফিক প্রত্যেক শরীরের সাথে রুহ ও আত্মার সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শরীরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আবার শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا

> এবং স্মরণ করো ওই সময়ের, যখন তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের আত্মার ওপর সাক্ষী রেখে বললেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সমস্বরে সকলেই বলে উঠল, নিশ্চয় আপনি আমাদের রব এবং আমরা নিজেরা এ ব্যাপারে সাক্ষী।[১৩২]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা এ অঙ্গীকার আমাদের রুহ থেকে নিয়েছিলেন, যখন আমাদের শরীর বিদ্যমান ছিল না।[১৩৩]

---

১৩২ (সুরা আরাফ, ১৭২)

১৩৩ *শরহু আকিদায়ে সাফারানিয়া*, ২/৩৮।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, উক্ত অঙ্গীকার তো আমাদের স্মরণে নেই, তাহলে উক্ত অঙ্গীকারের যথার্থতা কী থাকল? এর উত্তরে আমরা বলব, উক্ত অঙ্গীকার যদিও আমাদের বিস্তারিতরূপে স্মরণ নেই, কিন্তু উক্ত অঙ্গীকারের নিদর্শন প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান এবং জিহ্বায় জারি রয়েছে। কেননা অন্তর আমাদেরকে একজন সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বান্দা যখন কোনো কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়, তখন অন্তর ও জবানে ওই পালনকর্তার নামই সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় এবং তাঁর নিকটই প্রার্থনার জন্য হাত উত্তোলিত হয়। আল্লাহ তাআলা হজরত আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালামকে উক্ত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তার সাথে কৃত ওয়াদাকে পূর্ণ করে সে সৌভাগ্যবান, আর যে নির্বোধ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সে হতভাগা ও বঞ্চিত।

মৃত্যুর পরে রুহ ধ্বংস হয় না

কুরআনের আয়াত ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, মৃত্যুর পরে রুহ শরীর থেকে বের হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় না। বরং অন্য জগতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। তাদের বোধবুদ্ধি ও উপলব্ধি বহাল থাকে এবং তারা আল্লাহ তাআলার কালাম শুনতে পায় এবং ফেরেশতাদের কথা বুঝতে পারে। কেননা হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত জাবির রা.-কে বলেন,

أَنَّ اللهَ كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।[১৩৪]

হাদিসে এসেছে, বিরে মাউনার শহিদদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে,

بَلِّغُوا عنّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا.

---

১৩৪ ইবনুল জাওযি, *গরিবুল হাদিস*, ২/২৯৫। সহিহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে, *সুনানু তিরমিজি*, ৩০১০। *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১৯০। হাসান সহিহ।

আমাদের গোত্রের নিকট সংবাদ পৌঁছে দিয়ো! আমরা আমাদের রবের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে তুষ্টহৃদ করেছেন।[১৩৫]

স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ সমস্ত কথাবার্তা রুহের সাথে হয়েছিল, শরীরের সাথে নয়। মৃত্যুর পরে এই খোলসধারী শরীর থেকে রুহের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য একটি শরীরের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়, যাকে জিসমে মিসালি তথা কল্পশরীর বা প্রতীকী শরীর বলা হয়। অতঃপর রুহ উক্ত কল্প ও প্রতীকী শরীর ধারণ করে বিভিন্ন উপকারিতা ও চাহিদা উপভোগ করতে থাকে। মৃত্যুর পরে রুহের শক্তি ও গুণাগুণে কোনো ধরনের কমতি আসে না। বরং পূর্বের তুলনায় আরও বেশি উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে যায়। কেননা কবরজগতের প্রতীকী শরীর পার্থিব জগতের মৌল উপাদানে গঠিত শরীর থেকে অধিক তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী হয়ে থাকে।

আলমে বরজখ (কবরজগৎ)

পারলৌকিক জগতের প্রথম মনজিল কবরজগৎ। হাদিসে এসেছে,

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ

'যে মৃত্যুবরণ করল তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল।[১৩৬]

কবরজগৎকে কিয়ামতে সুগরা তথা ছোট কিয়ামত বলা হয়। এই কিয়ামতে সুগরা তথা মৃত্যু থেকে নিয়ে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত সময়ের মাঝে যে মুহূর্ত অতিবাহিত হয়, একে আলমে বরজখ তথা কবরজগৎ বলে। কেননা মৃত্যু ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার নাম নয়, বরং শরীর থেকে রুহ আলাদা ও পৃথক হওয়ার নাম মৃত্যু।

সুতরাং শরীর থেকে রুহের বাহ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর হাশর পর্যন্ত অবস্থানের জন্য একটি জায়গার প্রয়োজন হয়। শরয়ি পরিভাষায় উক্ত মধ্যবর্তী

---

১৩৫ *সহিহ বুখারি*, ৪০৯০। *সহিহ মুসলিম*, ৬৭৭।

১৩৬ কাশফুল খাফা-১/১৫১,

জায়গায় অবস্থানের নাম বরজখ। কেননা বরজখ অর্থ, পর্দা, অন্তরায় বা মধ্যবর্তী স্থান। মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা, এ কারণে উক্ত অবস্থাকে বরজখ নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

> তাদের মৃত্যুর পরে একটি পর্দা বা ঘাঁটি রয়েছে, যাতে তারা হাশর ও পুনরুত্থান পর্যন্ত অবস্থান করবে।[১৩৭]

জগৎ তিনটি, যথা ইহলৌকিক জগৎ, কবরজগৎ, পারলৌকিক জগৎ। কবরজগৎ যেহেতু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগতের মাঝে অবস্থিত, এ কারণে একে বরজখ বলা হয়। হাদিসের মধ্যে কবরে যে সুখশান্তি ও আজাব-গজবের কথা বর্ণিত হয়েছে, উক্ত কবর দ্বারা মাটির গর্ত উদ্দেশ্য নয়, যেখানে মৃত লাশকে দাফন করা হয়। বরং হাদিসে উক্ত কবর দ্বারা আলমে বরজখ তথা কবরজগৎ উদ্দেশ্য, যেখানে মৃত ব্যক্তির প্রশ্নোত্তর এবং জান্নাতের নাজ-নিয়ামত ও জাহান্নামের আজাব-গজব প্রদান করা হয়। কাউকে যদি নেকড়ে অথবা বাঘ ভক্ষণ করে, তাহলে সেটিই তার বরজখ ও কবরজগৎ। কাউকে আগুন দিয়ে পোড়ানো হলে যেখানে তার অংশ থাকবে সেখানেই তার কবরজগৎ শুরু হবে। কিন্তু যেহেতু শরিয়তে কাফন-দাফনের বিধান দেওয়া হয়েছে, এ কারণে হাদিসে আলমে বরজখকে কবর নামে ব্যক্ত করা হয়েছে।

কবরের শাস্তি শরিয়ার অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কবরের আজাব থেকে পানাহ চাওয়ার হাদিস মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই কবরের আজাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয়-সন্দেহ থাকতে পারে না। কবরের আজাব অস্বীকারকারীদের যুক্তি, আমরা মৃত ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখে থাকি, কিন্তু আজাব হচ্ছে বলে তার শরীরে কোনো নিদর্শন বা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই না এবং অনুধাবনও করতে পারি না, তাহলে কবরে আজাব হয় কীভাবে বিশ্বাস করব? তাদের উত্তরে আমরা বলব, কবরের আজাব হয়ে থাকে অন্য জগৎ তথা আলমে বরজখে। আলমে বরজখকে এ চাক্ষুষ জগৎ ও বস্তুজগতে অবস্থান করে চর্মচোখ দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয়। এক ব্যক্তি স্বপ্নজগতে বিভিন্ন আশ্চর্যজনক বস্তু দেখতে

---

১৩৭ (সুরা মুমিনুন, ১০০)

থাকে। অথচ কোনো ব্যক্তি তার পাশে বসে থাকা সত্ত্বেও কিছু দেখতে পায় না এবং উপলব্ধিও করতে পারে না। এখন যদি উক্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে স্বপ্নজগতের বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থা এমন এক ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করে, যার কোনোদিন স্বপ্ন দেখার সুযোগ হয়নি, তাহলে সে তা তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করে বসবে এবং এক মুহূর্তের জন্য মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না এটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি স্বাপ্নিকের নিকট তার স্বপ্ন সাব্যস্ত করার জন্য যৌক্তিক কোনো প্রমাণের দাবি জানায়, তাহলে সে নির্বোধ বই আর কী হতে পারে। স্বপ্ন দেখনেওয়ালা তখন বলবে, হয়তো আপনি কখনো ঘুমাননি, কাজেই যখন ঘুমাবেন তখন আপনার নিকট স্বপ্নের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তেমনই আমরাও একই উত্তর দিয়ে বলব, যখন মরবে তখন বুঝতে পারবে কবরে কী চলে!

যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। জান্নাতও রয়েছে দোজখও রয়েছে, বিশ্বাস না হলে মরে দেখো!

সমাপ্ত

উসুলে ইসলাম বা ইসলামের মূলনীতি গ্রন্থটি আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রহ. রচিত 'আকাইদুল ইসলাম' ও 'ইলমুল কালাম' গ্রন্থদ্বয়ের সারনির্যাস। এতে তিনি ইসলামি আকিদার অনন্যতা ও উৎকর্ষ খুব জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাথে সাথে তিনি অন্যান্য ধর্ম-মতবাদ ও আকিদা-বিশ্বাস উল্লেখ করে সেগুলোকে অকাট্য দলিল-প্রমাণের আলোকে খণ্ডন করেছেন। এরপর তিনি নবুয়তের ওপর উত্থাপিত নাস্তিক, মুরতাদদের বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও অভিজ্ঞ আলিমদের বক্তব্য দ্বারা সমুচিত উত্তর পেশ করেছেন। মিরাজ ও মুজিজা নিয়ে দার্শনিক ও সায়েন্টিস্টদের মস্তিষ্কপ্রসূত দাবিদাওয়া ও তাদের অসাড় মতবাদের গোড়ায় আঘাত হেনে সেগুলোকে শুধু নড়বড়ে করে দেওয়াই হয়নি বরং সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। আখিরাত, কবরজগৎ, রুহ ও ফেরেশতা প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক আকিদাগুলো মূলনীতির আলোকে গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। আমরা আশা করি গ্রন্থটি আকিদা ও সিরাহ অধ্যয়নের মূলনীতি হিসেবে কাজে দেবে ইনশাআল্লাহ।